দেশের বড়দা

নবীনের সংসার, জল-প্লাবন, হালদার বাড়ী, সবিতার আরাধনা,
প্রবাসীর প্রত্যাগমন, শিক্ষা-বিস্তার, মণিকণা,
হিতবাণী প্রভৃতি রচয়িতা

শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী প্রণীত

ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্

ময়মনসিংহ ও কলিকাতা।

ভাদ্র, ১৩২৫

মূল্য পাঁচ সিকা মাত্র।

উৎসর্গপত্র।

আমার

"দেশের বড়্‌দা",

আমার বড়্‌দা'—

ডাক্তার সত্যপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারীর

কর-কমলে

অশেষ শ্রদ্ধার সহিত

অর্পণ করিলাম।

১৩২৫, ১২ই ভাদ্র—জন্মাষ্টমী।

দেশের বড়দা'।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ঠিক্ তখনও ভোর হয় নাই, আর ঠিক্ তখন রাত্রিও নাই—সেই সময়ে জনাবালি মণ্ডল, চিন্তামণি বসুর দ্বারে ধাক্কা মারিয়া করুণ কণ্ঠে ডাকিল—

"বর্‌দা', ও বর্‌দা',—বর্‌দাগো !"

"নিশি ডাকার" ভয়ে বাংলা দেশের অনেক লোক যে তিন ডাকে সাড়া দেয় না, জনাবালি তাহা জানিত। সুতরাং তাহাকে চতুর্থবার ডাকিতে হইল—

"বর্‌দা' !"

তখন দ্বারের অর্গল মুক্ত করিয়া বাহিরে আসিয়া চিন্তামণি কহিলেন—

"কেন রে জনাব, বিপিনের অসুখ আবার বেড়েছে নাকি ?"

জনাবালি পূর্ব্বেই একবার চিন্তামণিকে সেলাম করিয়াছিল। কিন্তু সে ভাবিল—তাহার সেলাম্, 'বর্‌দা' হয়ত দেখিতে পান নাই। সুতরাং সে আবার সেলাম করিয়া কহিল—

"এজ্ঞে ব্যামোহ ত খুবই বার্‌ছে। আপনকার্ কহত্ মত আপনকারে জানুন্ দেবার্ আস্‌ছি। দা'ঠাউরের জ্বরের ব্যাগ্‌টা, শুন্‌তেছি, খুবই হইছে। আর পেপাসাও খুব নাগ্‌তিছে।"

আপনার মস্তকে হস্ত বুলাইতে বুলাইতে চিন্তামণি কহিলেন—

"আরে সে ত আমি রাত্ দুটোর সময় যখন বাড়ী এসেছি, তখনই দেখে এসেছি। তুই আর নতুন খবরটা কি দিলি—তা' ব'ল? আর কিছু উপদ্রব বেড়েছে?"

"এজ্ঞে তা' মুই কইতে লারব। সকল দা'ঠাউর্‌রা কইল—বর্‌দা'রে খবর দেও। মুই তাই খবর দেতে আস্‌ছি বর্‌দা'।"

"খুব করেছ, খুব বুদ্ধিমান তুমি; আর খুব বুদ্ধিমান তোমার দা'-ঠাউরেরা। চল এখন। না রে দাঁড়' একটু, মুখটা ধুয়ে আসি।"

চিন্তামণি, মুখাদি প্রক্ষালন করিতে বাটীর মধ্যে চলিয়া গেলেন। জনাবালি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল—"আচ্ছা, বর্‌দা' যে হ্যাত বকৃতি নেগেছে, সেডার কারণডা কি?"

জনাবালি আরও ভাবিতে লাগিল, সংসারের মধ্যে পাকাবুদ্ধি আছে—এক বড়্‌দা'র। বড়দা'র নীচে বুদ্ধিমান হইল—জনাবালি স্বয়ং। তথাপি বড়্‌দা' তাহার বুদ্ধির নিন্দা করিলেন কেন?

ইতিমধ্যে বেশ ফর্‌সা হইয়া গেল। গাছে গাছে, মাঠে মাঠে নানা-জাতীয় পক্ষীর কলধ্বনিতে দিকদিগন্ত তখন বেশ মুখরিত হইয়া উঠিল,—সিন্দূররঞ্জিত প্রাচীর আকাশ-চত্বর বেশ উজ্জ্বলতা ধারণ করিল,—আর দূরাগত বংশীধ্বনির ন্যায় রাখাল বালকের মেঠো ভোরাই সুর বেশ জমাট্ হইয়া ব্যোমস্থল ঝঙ্কৃত করিতে লাগিল। রাখালী-সুর গাছে ঠেকিয়া, পুষ্করিণী ও নদীর জলে আছাড় খাইয়া অভিমান ভরে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল। সুরের সে অভিমান যে বুঝিতে পারে, সুরের জন্য ব্যাকুলতা তাহার ত হইবেই; পরন্তু তাহা বুঝিবার যাহাদের শক্তি নাই, তাহাদেরও মাথা খারাপ হইয়া যায়। সুর যে ব্রহ্ম!

ব্রহ্মে বিশ্বাস না থাকিলেও মিষ্ট সুর ভাললাগে সকলেরই।

জনাবালিও "মেঠো সুরে" খুব আকৃষ্ট হইয়াছিল। সে হাঁ করিয়া প্রভাত-কালীন নৈসর্গিক শোভা দেখিতেছিল, আর কাণ পাতিয়া ভোরাই সুর শুনিতেছিল। সুরটা কাণের ভিতর দিয়া এমন এক স্থানে আসিয়া পড়িতেছিল যে সে স্থানের মাহাত্ম্যে লোক রোগ-শোক, ব্যথা-বেদনা, ক্ষুধা-তৃষ্ণা সমস্ত ভুলিয়া না যাইয়া আর থাকিতে পারে না। স্থান, কাল বিবেচনা করিয়া "সুর লাগাইতে" পারিলে কি আর রক্ষা আছে! সুরের শক্তিতে, ভক্ত, ভগবানের দর্শন পায়— ক্ষুধা-তৃষ্ণাদি ভুলিয়া যাওয়া ত তুচ্ছ কথা।

মুখ প্রক্ষালনাদি কার্য্য সমাপনান্তে চাদর খানা স্কন্ধে ফেলিয়া চিন্তা-মণি বাটীর বাহির হইয়া কহিলেন—

"চল্, জনাব্! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোর একটু কষ্ট হ'ল। তা' বস্‌লেই ত হ'ত দাদা।"

জনাবালি মিঞার এতক্ষণে জ্ঞান হইল যে "বড়্‌দা" আসিয়া তাহাকে ডাকাডাকি করিতেছেন। সে তাড়াতাড়ি আপনাকে সামলাইয়া তাড়া-তাড়ি বলিল—

"তা' হ'ক্ গে ক্যান্নে বর্‌দা'—আপনকার ঘরকে আবার বসা দাঁড়া কি—উ-সব সমান। তা' চলেন, ক্যান্নে বর্‌দা', আর দাঁইরে থেক্কে বিলোম্ করা ক্যান্নে গো? 'দা' ঠাউরেরা সিথানে কতই না ভাব্‌তিছে।"

একটু হাসিয়া চিন্তামণি গন্তব্যপথে অগ্রসর হইলেন—জনাবালি তাঁহার অনুসরণ করিল।

পথে যাইতে যাইতে অনেক স্ত্রীলোক ও পুরুষের সহিতই চিন্তামণির সাক্ষাৎ হইল। পুরুষদের সকলকেই তিনি কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন; স্ত্রীলোকগণের মধ্যে যাহাদের সহিত তাঁহার কথা কহিবার সম্বন্ধ,

তাহাদের সহিত কথা কহিলেন, আর যাহাদের সহিত সে সম্পর্ক নাই, তাহারা মাথার কাপড় টানিয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল। দেশের স্ত্রী-পুরুষ—আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা চিন্তামণিকে ভালবাসে ও ভক্তি শ্রদ্ধা করে। শ্রদ্ধা ও ভালবাসার যোগ্য না হইলে শ্রদ্ধা ভালবাসা পায়ই বা কে ?

অসংখ্য তারকামণ্ডিত ছায়াপথের মত অসংখ্য বৃক্ষাচ্ছাদিত সঙ্কীর্ণ পথে চলিয়া, সঙ্কীর্ণ নদীর দুইটা বাঁক ঘুরিয়া চিন্তামণি "বাঁড়ুযোদের গঙ্গার" সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। অনেক পল্লীগ্রামে অনেকেরই একটা করিয়া গঙ্গা থাকে। যথা "ঘোষেদের গঙ্গা", বোসেদের গঙ্গা" ইত্যাদি। নদীটাকে ভাগাভাগি করিয়া এই সকল গঙ্গার সৃষ্টি। গঙ্গাধর তাহাতে কি মনে করেন—কে জানে!

"বাঁড়ুযোদের গঙ্গার" সম্মুখে উপস্থিত হইয়া একটী অভ্রভেদী তিন্তিড়ীবৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া চিন্তামণি, হরেকৃষ্ণ চোঙ্গদারকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"বিপিন কেমন আছে হে চোঙ্গদার ?"

হরেকৃষ্ণ, মুখ বিকৃত করিয়া কহিল—

"বড় ভাল নয়, বড়্দা! তুমি শীগ্‌গির যাও। বিপিন কেমন কর্‌ছে, আর তোমায় কেবল খুঁজ্‌ছে। আমি চল্লুম বদ্দি ডাক্‌তে।"

হরেকৃষ্ণ আর দাঁড়াইল না। চিন্তামণি ধীরে ধীরে তিন্তিড়ী-বৃক্ষ সম্মুখস্থ একটী নাতিক্ষুদ্র দ্বিতল বাটীতে প্রবেশ করিলেন। সেই বাটীর অধিকারী বিপিনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়—এখন মুমূর্ষু।

রোগীকে ঘেরিয়া অনেক লোকই সেখানে বসিয়াছিল। চিন্তামণিকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সকলেই মৃদুস্বরে বলিল—

"বড়্দা' এসেছে, বড়্দা' এসেছে।"

বড়্দা'র আগমন-সংবাদ রোগীর কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল। বিপিন-কৃষ্ণ চক্ষুরুন্মীলিত করিয়া ক্ষীণকণ্ঠে কহিল—

"এসেছ বড়্দা'—আঃ—"

রোগীর নাড়ী পরীক্ষা করিতে করিতে চিন্তামণি কহিলেন—

"আমি ত তোমার কাছেই ছিলেম্ ভাই! কেবল ঘণ্টা কয়েকের জন্য বাড়ী গিছ্লেম্। তোমার কি কষ্ট হচ্ছে দাদা?"

চিন্তামণির দিকে অতিকষ্টে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া রোগী একটু জল খাইতে চাহিল। জলপান করিয়া বিপিনকৃষ্ণ কহিল—

"কষ্ট! কে জানে কি কষ্ট হচ্ছে। তবে তোমাদের কোলে আর থাক্‌ছি নে বড়্দা'! বৌ, সতীলক্ষ্মী; অনেক দিন আগেই চ'লে গেছে। এইবার আমিও চল্লেম্ বড়্দা'। ছ'মাসের ছেলে রেখে বৌ গিছ্ল, পাঁচ বছরের সতুকে রেখে আমি যাচ্ছি। সতুর ভার তোমার উপর বড়্দা'—তা'র আর কেউ রইল না।"

বিপিনকৃষ্ণ কাঁদিতে লাগিল। চিন্তামণিও নয়নবারি রুদ্ধ করিতে পারিলেন না। গৃহমধ্যে অন্যান্য সকলে যাহারা উপস্থিত ছিল, তাহারাও কাঁদিতে লাগিল। সকলেই বুঝিয়াছিল—বিপিনকৃষ্ণ এ যাত্রা আর রক্ষা পাইবে না। তথাপি চিন্তামণি রোগীকে সাহস দিয়া কহিলেন—

"ভয় কি, আবার সেরে উঠ্বে।" বিপিনকৃষ্ণের মুখে ম্লান হাসি ফুটিয়া উঠিল; কিন্তু যে মুখে মৃত্যুর কালিমা পড়িয়াছে, সে মুখে সে হাসি আর কতক্ষণ থাকিতে পারে?

মৃত্যু-তীর্থের পথিক তখন পাঁচবৎসরের পুত্র সত্যেন্দ্রকে নিকটে ডাকাইয়া—খুব কাছে টানিয়া, গাঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিয়া, মুখের উপর মুখ রাখিয়া খানিকটা চুপ্ করিয়া পড়িয়া রহিল। পিতার সে ভাব, সে অবস্থা, পুত্র ইতঃপূর্ব্বে আর কখনও দেখিতে পায় নাই। এখন তাহা

দেখিয়া কাজেই তাহার ভয় হইল। বালক, ফুলিয়া ফুলিয়া, অবশেষে চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। বালককে স্থানান্তরিত করা ভিন্ন চিন্তামণি আর কোনও উপায় দেখিলেন না।

রোগীর আর চৈতন্য নাই—নাভিশ্বাস আরম্ভ হইয়াছে। নাড়ী আর খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। হরেকৃষ্ণ চোঙ্গদার বৈদ্য সঙ্গে যখন সে গৃহে উপস্থিত হইল, বিপিনকৃষ্ণের আত্মা তখন পরলোকে। ইহলোকে পড়িয়াছিল বিপিনকৃষ্ণের দেহ। মুখ পর্য্যন্ত ঢাকা দিয়া সে দেহের উপর তখন চাদর টানিয়া দেওয়া হইয়া গিয়াছে।

——•——

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বিপিনকৃষ্ণের বাৎসরিক হাজার টাকা মুনফার একখানি ছোট তালুক ছিল। তাহা ভিন্ন অন্যান্য জোৎজমাও যে কিছু না ছিল, এমন নহে। কিন্তু তাহাতেও লোকটার খরচ কুলাইত না। তাহার কারণ বিপিনকৃষ্ণ লোকটা ব্যবসায় বাণিজ্য না বুঝিয়াও ব্যবসায় করিতে গিয়াছিল। তাহাতেই বিস্তর লোক্‌সান পত্র হইয়া যাওয়ায় তাহাকে ঋণগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। যাহার ঋণ আছে, তাহার যত আয়ই থাকুক্ না কেন, সঞ্চয় করা তাহার আর কিছুতেই ঘটিয়া উঠে না।

বিপিনকৃষ্ণ, সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া যাইতে পারে নাই কিছুই। রাখিয়া গিয়াছিল—ছয় সাত হাজার টাকা দেনা, আর একটী অসহায় নাবালক পুত্র। কাহারও কাহারও ধারণা, বিপিনকৃষ্ণের অসুখের প্রধান হেতু—দুশ্চিন্তা এবং সেই দুশ্চিন্তাই তাহার অকালমৃত্যুর কারণ।

সে যাহা হউক, বিপিনকৃষ্ণ লোকান্তরিত হইবার অব্যবহিত কাল পরেই চিন্তামণি সত্যেন্দ্রকে আপন বাটীতে আনয়ন করিলেন। সেরূপ করা ভিন্ন চিন্তামণির আর উপায় কি? সত্যেন্দ্রের সম্পূর্ণ ভার চিন্তামণির উপর দিয়া বিপিনকৃষ্ণ যে নিশ্চিন্ত হইয়া মরিতে পারিয়াছে!

যথাসময়ে শ্রাদ্ধাদি চুকিয়া গেল। তাহার পর গ্রামের মাতব্বর লোকদিগকে ডাকাইয়া চিন্তামণি কহিলেন—

"বিপিন ত অনেকগুলি টাকা দেনা রেখে মারা পড়েছে। তা'র ছেলেও নাবালক। এমন স্থলে কি করা উচিত, সেটা কি আমাদের একবার ভাবা উচিত নয়?"

বহুলোক বহুকণ্ঠে বলিল—

“নিশ্চয়, নিশ্চয়।”

কিন্তু উপায়—বিশেষ কেহ কিছুই স্থির করিতে পারিল না। উপায় নির্ণয় করিবার ভার পড়িল—চিন্তামণির উপর। টাকা লওয়ার উপায় সকলেই স্থির করিতে পারে, কিন্তু দেনা দেওয়ার উপায় স্থির করে কয়জন? হাতপাতা যতটা সহজ, হাত “উপুড়” করা ততটা সহজ নহে।

পাওনাদার সেইস্থানেই উপস্থিত ছিল—সে কহিল—

“ও আর ভাবাভাবি—উপায় স্থির করা আর কি বড়দা’? আমার টাকা আমি ত আর ফেলে রাখ্‌তে পা’রব না। আমি বলি কি, আদালত থেকে “অছি” নিযুক্ত ক’রে, বিষয় বিক্রী ক’রে ফেলা হ’ক্‌। তা’রপর আমার টাকা আমি নেই, বাকী যা’ থাক্‌বে, তা’ বিপিনবাবুর ছেলেকে দিলেই চল্‌বে। সে তাই নিয়ে ভোগদখল করতে থাক্‌—তা’তে আমার কোনো আপত্য নেই।”

সে কথা শুনিয়া অনেকেই বলিল—“সেটা ন্যায্য কথা। পাওনাদার পাওনা ছাড়্‌বে কেন—বিশেষ যখন বিপিনের বিষয় আসয় আছে।”

চিন্তামণি একটু ভাবিয়া, একটু হাসিয়া কহিলেন—

“তা’ত বটেই, পাওনা ছাড়্‌লে পাওনাদারের চল্‌বে কেন? তা’ হলধর, তোমার পাওনা কত?”

পাওনাদারের নাম হলধর। সুদে টাকা খাটাইয়া সে অনেক টাকা জমাইয়াছে। টাকা জমানই তাহার নেশা। খরচ বড় সে করিতে চাহে না। আর খরচ তাহার তেমন নাইও। লোকের বাড়ী চাহিয়া মাগিয়া তাহার সংসার চলে। তাহার ভিক্ষা বৃত্তির উল্লেখ করিয়া কেহ কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিলে অম্লানবদনে সে বলিয়া থাকে—তাহার

সঞ্চিত অর্থ যাহা কিছু ছিল, তাহা সমস্তই পরহস্তগত ; এরূপ ক্ষেত্রে ভিক্ষা না করিয়া তাহার আর উপায় কি ?

হলধর, চিন্তামণির প্রশ্নের উত্তর না দিয়া লাল খেরুয়া বাঁধান এক খানা খাতা বাহির করিল। তৎপরে সেই খাতা ও কয়েকখণ্ড "ষ্ট্যাম্প" মারা কাগজ পরীক্ষা করিয়া চক্ষের উপরিস্থিত ভাঙ্গা চশ্‌মা খানা কপালে তুলিয়া কপাল টানিয়া বলিল—

"না—টাকা এমন কিছু বেশী নয়। তবে ছাড়্‌ছোড়্‌ দিয়েও দেখ্‌ছি, এখনও আমার মবলগ্‌ টাকা পাওনা—পাঁচহাজার তিনশো টাকা বার আনা সাড়ে তিন পাই। গণ্ডা কড়া তবু ছেড়েই দিয়েছি। মরুক্‌ গে যা'ক্‌, তুমি বড়্‌দা', যোগাড়্‌ সোগাড়্‌ ক'রে আমায় পাঁচহাজার তিন শো টাকাই ফেলে দাও। আমি তা'ই খুসী হ'য়ে নিয়ে চ'লে যাই। কাজ কি অত ঝঞ্ঝাটে—নালিস্‌, আদালত, উকীল, মোক্তার,—সে সব ফ্যাসাদে কাজ কি বড়্‌দা' !"

হলধরের কথা শুনিয়া ও তাহার হাস্যোদ্দীপক অঙ্গভঙ্গী দেখিয়া চিন্তামণি না হাসিয়া আর থাকিতে পারিলেন না। অন্যান্য সকলেও হাসিয়া ফেলিল। তবে বেশী কথা কেহই বড় একটা কহিতে সাহস করিল না। এমন কি দেশের জমীদার রামরঞ্জন বাবুও নহে। অনেকেরই দলিল, পাট্টা, অলঙ্কার, পিত্তল কাঁসার বাসন প্রভৃতি ঋণের দায়ে হলধরের নিকট আবদ্ধ। হলধর চটিলে আর কি রক্ষা আছে !

চিন্তামণির অবশ্য সে ভয় ছিল না। তিনি হাসিতে হাসিতে কহিলেন—

"টাকাটা যেন হলধর নগদই পেয়ে গেল। ওর কথার ধরণটা অনেকটা সেই রকমের।"

দড়িবাঁধা চশমাখানা ছেঁড়া কাগজের খাপে পুরিয়া রাখিয়া হলধর বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে কহিল—

"সে কি বড়্দা'! আমি ত তাই মনে ক'রেই খাতাপত্র নিয়ে আজ তোমার কাছে এসেছি। তা' না হ'লে আমার আস্বার দরকারটাই বা ছিল কি, আর জমীদার বাবু ও অন্যান্য সকলকে এতটা কষ্ট দিয়ে এখানে আনাই বা কেন?

চিন্তামণি এইবার একটু রাগিয়া উঠিলেন। তিনি বলিলেন—

"আমার দুর্ব্বুদ্ধি! থাক্গে সে কথা। সবাইকে যে কেন আমি আমার ভাঙ্গা কুঁড়েতে জড় করেছি, সেই কৈফিয়ৎটাই আমাকে আগে দিতে হচ্ছে দেখ্ছি।"

এই কথা বলিয়াই তিনি সত্যেন্দ্রকে নিকটে ডাকাইয়া আনিলেন। তাহার পর সত্যেন্দ্রকে দেখাইয়া তিনি কহিলেন—

"সকলকে জড় করেছি, এই বাপ্ মা মরা শিশুটীকে দেখিয়ে সকলের কাছ থেকে দয়া ভিক্ষে করবার জন্য। তা' না হ'লে আমার পা ছিল —লোকের দ্বারে দ্বারে গিয়ে আমার বক্তব্য আমি ব'লে আস্তে পার্তেম্।"

রামরঞ্জন বাবু কহিলেন—

"তুমি রাগ করছ কেন বড়্দা'? আমাদের কি কর্তে হ'বে, তাই বল।"

"ব'লব আর কি দাদা! আমি কেবল এই বল্তে চাই যে পাঁচ-হাজার তিনশো টাকা বার আনা সাড়ে তিন পাই এর জন্যে কি এই এতটা টাকার সম্পত্তি বিকিয়ে যা'বে—বিশেষ, সেটা যখন নাবালকের সম্পত্তি?

খাতাপত্র "খেরুয়ায়" বাঁধিতে বাঁধিতে হলধর কহিল—

"তা' যা'বে বৈকি বড়্দা'! আমার টাকাটা ত আর কুড়োন টাকা নয় যে ছেড়ে দিলেই হ'ল?

চিন্তামণি, আপনার মাথার টাকটা কণ্ডুয়ন করিতে করিতে কহিলেন—

"তা' জানি না। তবে যে তুমি সুদ অনেক খেয়েছ, তা' জানি। ভাল, তুমি আদালতে যাও। দেখ, ছট্ বল্‌তেই টাকা আদায় করা কত শক্ত।"

খাতা বগলে করিয়া হলধর বলিল—

"তা' ব'লে কি টাকাটা আমার ডুব্‌বে?"

"তা' হ'তে পারে!"

"টাকাটা পা'ব না?"

"হ'তে পারে!"

"টাকাটা কি আমার খোলাম্ কুঁচি?"

"হ'তে পারে—অসম্ভবই বা কি?"

"এ ত ভারী বিপদের কথা! এমন বিপদে আমি কখনও পড়ি নি!"

"না হয় একবার পড়্‌লে—বিপদ কখনও হয় নি ব'লে যে কখনও হ'বে না, তা'র ত কোনও লেখাপড়া দলিল দস্তাবেজ নেই!"

"তা' হ'লে আমায় আদালতেই যেতে হ'বে?"

"তোমার ইচ্ছা—সখ। মোদ্দা তা'তে চট্ ক'রে তোমার টাকা আদায় হ'বে না। নাবালকের বিষয়—বেচা বড় কঠিন হে হলধর। ওর বাপ্ থাক্‌তে যেটা খুব সহজে পার্‌তে, এখন আর সেটা তত সহজ হ'বে না। আমি চেষ্টা ক'রে নাবালকের বিষয় "কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডসে" দেওয়াব। তা'রপর যা'হয় হ'বে। বুঝেছ, হলধর?"

"কোটার অড্—সে আবার কি পদার্থ!

"টাকা সুদে খাটাও—সেটা আর জান না? ন্যাকা আর কি! 'যা'ক্, কথায় যা' বল্‌লেম্, কাজেও তাই ক'রব।"

"এ্যা !"

"হাঁ ঠিক্ তাই—আমি সোজা কথা ব'লে রাখ্ছি।"

"তা' হ'লে কি হ'বে বড়্দা ?"

সকলে মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল। হলধরের সহিত যাহাদের টাকা-কড়ি সম্বন্ধে বাধ্যবাধকতা ছিল, তাহারা হলধর মহাজনের পরাজয় ও লাঞ্ছনা দেখিয়া মনে মনে খুব আনন্দানুভবই করিতেছিল। খাতক মহাজনের এইরূপই সম্বন্ধ। কিন্তু মুখ ফুটিয়া কেহ কোনও কথা বলিতে সাহস করিতেছিল না। যাহার টাকা আছে, যাহার নিকট লোক টাকার প্রত্যাশা করিয়া থাকে, সে হীন হইলেও লোকে তাহার মুখের উপর কিছু বলিতে চাহে না। যাহার টাকা, সে যদি সে কথা না বুঝিতে চাহে, তবে তাহাকে তাহা বুঝাইবে কে—আর বুঝাইবার আবশ্যকই বা কি ?"

চিন্তামণি সত্যেন্দ্রকে ক্রোড়ে বসাইয়া কহিলেন—

"দেখ হলধর, একটা কায আমি ক'র্তে পারি। তা'তে তোমার টাকাও ডুব্বে না, আর নাবালকের বিষয়টাও রক্ষা পাবে।"

উপস্থিত সকলেই চিন্তামণির দিকে বিস্মিত নয়নে চাহিয়া রহিল। চিন্তামণি কহিতে লাগিলেন—"কাযটা খুব ভারী কায নয়। নাবালকের বিষয়ের সমস্ত আয়টা—অবশ্য বিষয় রক্ষা কর্বার জন্য কিম্বা তহশীল প্রভৃতির জন্য যে টাকাটা খরচ হ'বে, সেটা বাদ্ যে টাকাটা থাক্বে, সেই টাকাটা সমস্ত তোমাকে দেওয়া যা'বে। তা'তে যতদিনে তোমার দেনা শোধ হয়।"

হলধর প্রথমে সে প্রস্তাবে সম্মত হইল না। কিন্তু যখন সে বুঝিল, দেশের সমস্ত লোক—দেশের বড়্দা'র মতেই মত দিতেছে, তখন বড়্দা'র প্রস্তাবে সম্মত হওয়া ভিন্ন তাহার আর কোনও উপায় রহিল না।

সুদ ধার্য্য হইল—শতকরা মাসিক আট আনা। পূর্ব্বে সুদের হার ছিল—শতকরা মাসিক পাঁচ পাঁচসিকা। উকীল ডাকাইয়া ও পাঁচজনকে সাক্ষ্য করিয়া চিন্তামণি সমস্ত বিষয় ঠিক করিয়া লইলেন। বিপিনকৃষ্ণের ঋণও তাহাতে শোধ হইতে লাগিল আর বিপিনকৃষ্ণের পুত্রও মানুষ হইতে লাগিল।
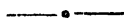
তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

চিন্তামণির কিছু জমী জমাও ছিল আর ধান চাউলের একটা কার্‌বারও ছিল। তাহাতে তাঁহার সংসার সুখে স্বচ্ছন্দে চলিত আর তাঁহার নিকট যে সকল দারিদ্র্যক্লিষ্ট ব্যক্তি আসিত, তাহাদেরও অন্ন বস্ত্রের কতকটা সাহায্য হইত। চিন্তামণি কখনও একাকী খাইতে জানেন না, একাকী সুখভোগ করিতে পারেন না। সে রকমটা তিনি করেন না বা পারেন না বলিয়াই তিনি "দেশের রড়দা'।"

বড় হইতে হইলে, বড় ত্যাগী পুরুষ হইতে হয়। দিবারাত্র স্বার্থ সাধনের চেষ্টা করিলে, স্বার্থের ছিপ্‌ ফেলিয়া—ফাৎনার দিকে চাহিয়া থাকিলে, পরার্থে কি আর কিছু করিতে পারা যায়! তবু বৃথাভিমান দৃপ্ত মানব মনে করে—অন্য লোক "বড়" হয়, সে "বড়" হয় না কেন? তাহাকে মানুষ মানিয়া চলে না কেন? যাহারা সেরূপ প্রকৃতির লোক, চিন্তামণির চরিত্র বিশ্লেষণ করিতে পারিলে, এ প্রশ্নের তাহারা উত্তর পাইবে।

ব্যবসায়, বাণিজ্য, জমী-জমা চিন্তামণি স্বয়ং কিছুই দেখিতেন না—বা তাহার সংবাদও রাখিতেন না। যাহা কিছু করিবার, তাহা তাঁহার একমাত্র পুত্র পীতাম্বরই করিত। পীতাম্বরের জননী অভয়াসুন্দরী সকল সময়েই সকল বিষয়ে পুত্রকে সুপরামর্শ দিতেন। সুতরাং পিতার উপদেশ না পাইলেও পীতাম্বরের বিশেষ কিছু ক্ষতি হয় নাই। পিতা-মাতার আশিষ-বর্ম্মে শরীর আবৃত করিয়া রাখিতে পারিলে, সংসার-সমরে আর কাহারও পরাজয়ের আশঙ্কা থাকে না।

পীতাম্বর, চিন্তামণির পুত্র হইলেও সে কিন্তু ঠিক্ পিতার মত হইতে পারে নাই। আয়ব্যয়ের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কিছু সঞ্চয়ের চেষ্টা পীতাম্বরের খুবই প্রবল। পিতামাতার অবাধ্য না হইয়াও পীতাম্বর তাহার মনোবাসনা পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিত। তবে সে বিষয়ে বেশী বাড়াবাড়ি করিলে পুত্র, পিতার নিকট তিরস্কৃত হইত। তাহার জন্য পীতাম্বরের অভিমানও হইত না আর সঞ্চয়ের স্পৃহাও হ্রাস পাইত না। পুত্র ভাবিত —পিতা সদাশিব, সংসারের ধার তিনি বড় একটা ধারেন না। তাঁহার তিরস্কারে ভগ্নোদ্যম হইয়া দুর্দ্দিনের জন্য কিছু সঞ্চয় করিয়া না রাখিলে —ভাণ্ডারের দ্বার রুদ্ধ করিলে, চলিবে কেন? টাকা না থাকিলে এ সংসারে গ্রাহ্যই বা করে কে আর দিনই বা চলে কিসে? আর পিতা ভাবিতেন—পুত্র এখনও অপরিণতবুদ্ধি যুবক। বয়স হইলেই তাহার বুদ্ধি হইবে, আর বুদ্ধি হইলেই তাহার হাতটা একটু বড় হইবে।

পীতাম্বরের বয়স বাড়িতে লাগিল বটে, কিন্তু তাহার "হাত বাড়িবার" লক্ষণ আদৌ দেখিতে পাওয়া যাইল না। চিন্তামণি, মনে মনে ক্ষুণ্ণ হইলেও সে বিষয়ে একেবারে নিরাশ হইলেন না। পুত্রকে নির্জ্জনে ডাকাইয়া পিতা একদিন কহিলেন—

"হ্যাঁরে পীতু, তোর টাকা জমাবার এত সখ হ'ল কেন বল্ দেখি?"

পরিণত বয়স্ক পুত্র পীতাম্বর অন্যের নিকট খুব একজন পাকা ব্যবসাদার, খুব একজন মুরুব্বী, খুব একজন তার্কিক বলিয়া পরিচিত হইলেও পিতার সম্মুখে সে কোনও কথা কহিতে সাহস করিত না। পিতার প্রশ্ন শুনিয়া পুত্র লজ্জিতভাবে চুপ্ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

চিন্তামণি বলিতে লাগিলেন—

"দ্যাখ্‌রে পীতু, টাকা হ'লেই সুখ হয় না, টাকা হ'লেই মান বাড়ে

না, আর টাকা রেখে যেতে পারলেই কীর্ত্তি থাকে না। মানুষ হ'তে গেলে মানুষের কায করা চাই,—তা'তে টাকা থাকুক্, আর নাই থাকুক্। টাকা টাকা ক'রে তুই যে রকম ক্ষেপেছিস্, তা'তে ঐ গোল টাকা একটা গোল না বাধায়—আমার সেই ভাবনা। বুঝ্ছিস্ রে আমার কথা ?"

পিতার মুখের দিকে একবার মাত্র চাহিয়া পীতাম্বর বলিল—

"আজ্ঞে হাঁ'।"

"আরে আজ্ঞে হাঁ, ত তুই বরাবরই বলিস্। আজ্ঞে হাঁ'র মত কায করিস্ কৈ ? আরে বাবা, খেয়ে প'রে, খাইয়ে পরিয়ে, বিলিয়ে ছড়িয়ে যেমন সুখ, টাকা সিন্দুক জাত ক'রে কষ্ট পেয়ে আর লোককে কষ্ট দিয়ে কি তেমন সুখ হয়, না মনে শান্তি থাকে ? টাকা খরচের জন্য, টাকা সদ্ব্যবহারের জন্য—বুঝ্লিরে বোকা ?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"আজ্ঞে হাঁ, ত সতুর পাঠশালের বেতন দিস্ নে কেন ? গুরু ম'শায় কয়েকবার তাগাদা ক'রেও টাকাটা পান্ নি কেন ?"

"আজ্ঞে, আমি ভেবেছিলেম্—ওর জমীজমার খাজনা আদায় হ'লে, তা'ই থেকে ও টাকাটা দেওয়া যা'বে।"

চিন্তামণি ভারী রাগিয়া উঠিলেন। পুত্রকে ধমক দিয়া তিনি কহিলেন—

"চুপ্—বেয়াদব। সতুর বিষয় থেকে টাকা খরচ কর্‌বার তুই কে বল্ দেখি ? ওর টাকায় ওর বাপের দেনা শোধ হ'বে। এক পয়সা, তুই ওর বিষয়ের আয় থেকে নিতে পাবি নে—ছুঁতে পাবি নে। তা' যদি করিস্ পীতু, তা' হ'লে এই বুড়ো বয়সে বিষয়কর্ম্ম আবার আমাকে দেখ্‌তে শুন্‌তে হ'বে। হাঁ রে, সেইটেই কি তোর ইচ্ছা ?"

পীতাম্বর সে প্রশ্নের উত্তর করিল না। অভয়াসুন্দরী সেই সময়ে সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কি হয়েছে গা—তুমি আজ এত রেগেছ কেন?"

চিন্তামণি হাসিয়া ফেলিয়া বলিলেন—

"দেখ দেখি গা, একবার পীতুর অন্যায়টা! ও সতুর টাকা খরচ করতে চায়। তা'ও কি কখনও হয় গা?"

অভয়াসুন্দরী, পীতাম্বরের দিকে চাহিয়া বলিলেন—

"বাপ্‌রে, তা'ও কি কখনও হয় বাবা পীতু! ওর বাপ্ দেনা রেখে গেছে। সে দেনা শোধ্‌বার ভার আমাদের। কেন বাবা পীতু, আমাদের অভাব কি যে আমরা ঐ নাবালকের টাকা খরচ ক'রব? তোর মত ছেলে পেটে ধ'রে আমি রাজার মা হয়েছি। আমরা ওর টাকা খরচ করতে কেন যা'ব বাবা?"

অভয়াসুন্দরী পূর্ব্বের কোন কথাই শুনেন নাই। মাঝখানের গোটা কয়েক কথা শুনিয়াই তিনি স্থির করিলেন—পীতাম্বর বুঝি সতুর বিষয়ের আয় তাহাদের সংসারে খরচ করিতে চাহে। সেই কারণে তিনি এতটা ব্যথিত হইয়া পড়িলেন। পীতাম্বরও মাতার মনের কথা বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। সে ভাবিল—সত্যেন্দ্রের পাঠশালার বেতনের কথা লইয়াই তাহার জননী বুঝি এ সকল কথার উল্লেখ করিতেছেন।

পিতামাতার নিকট তিরস্কৃত হইয়া পীতাম্বর মরমে মরিয়া গেল। সে ভাবিল—সত্যেন্দ্রের পাঠশালার বেতন বন্ধ করিয়াই সে যত বিপদ ডাকিয়া আনিয়াছে।

পিতামাতার নিকট ত্রুটী অপরাধ স্বীকার করিতে পীতাম্বর পশ্চাৎ-পদ হইল না। কিন্তু সত্যেন্দ্রের উপর মনে মনে তাহার বিষম ক্রোধ হইল। কারণ—সেই ত এ তিরস্কারের মূল। তাহার বিষয়ের আয়

খরচ করিতে না যাইলে ত পীতাম্বরকে এরূপভাবে অপ্রতিভ হইতে হইত না।

সত্যেন্দ্র সেই সময়ে পাঠশালা হইতে আসিয়া বাড়ী মাথায় করিল। অভয়াসুন্দরী তাহার জলযোগের ব্যবস্থা করিয়া দিবার জন্য তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলেন। চিন্তামণি, পীতাম্বরকে বুঝাইতে লাগিলেন—মানুষের কর্ত্তব্যটাই বড় জিনিস।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বেলা পড়িয়া যাইলে চিন্তামণি বামস্কন্ধে চাদর খানি ফেলিয়া, ধান-জমির "আইলের" উপর দিয়া বাঁধা বট্‌তলার দিকে চলিলেন। প্রতিদিন অপরাহ্লে গ্রামের লোক সেই বাঁধা বটতলাতেই বৈঠক্ করে। সে বৈঠকে ধর্ম্ম-তত্ত্ব, সমাজ-তত্ত্ব, রাজনীতি প্রভৃতি সকল বিষয়েরই আন্দোলন আলোচনা হইয়া থাকে। গ্রামের কাহাকেও শাসন করিবার আবশ্যক হইলে অথবা কাহারও গৌরব-মর্য্যাদা বর্দ্ধিত করিবার অনুষ্ঠান করিতে হইলে, সে কার্য্য সেই বাঁধা বট্‌তার বৈঠকেই সম্পন্ন হয়। মোট কথা—গ্রামের বটবৃক্ষতল বড় সামান্য স্থান নহে। অনেক শাসন, অনেক মর্য্যাদা-দান, অনেক বিচার, অনেক সমালোচনা, অনেক পরকুৎসা অনেক গ্লানি, আবার অনেক তত্ত্ব-কথা এই অক্ষয় বটবৃক্ষতলে হইয়া থাকে। সে বৃক্ষতলস্থ সভায় যাঁহারা বক্তা অথবা শ্রোতা, তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে একটা প্রগাঢ় সহানুভূতি আছে। সেরূপ সহানুভূতি কলিকাতা প্রভৃতি টাউনহলের বক্তা ও শ্রোতাগণের মধ্যে থাকিলে যে দেশের অনেকটা কায হইত, সে কথা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে।

চিন্তামণি সেই বট্‌তলার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তখন ধান কাটা হইয়া গিয়াছে। ক্ষেত্রগুলি বিশাল প্রান্তরে পরিণত। মাঠের পর মাঠ, গাছের পর গাছ, অনন্তের কোন্ চক্রবাক্ রেখায় যে মিশিয়া গিয়াছে, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। পড়ন্ত রৌদ্রের সোণালী ধারায় অনন্তের অনন্ত সুষমা তখন ফুটিয়া উঠিয়াছে—আলো ও ছায়ায় প্রান্তরের ও তৎপ্রান্তস্থিত বৃক্ষশ্রেণীর শোভা তখন অপরূপ!

সেই শোভা উপভোগ করিতে করিতে চিন্তামণি গন্তব্য স্থানাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পথে তাঁহার সহিত জনাবালি মিঞার দেখা হইল। জনাবালি হাল গরু লইয়া বাড়ী ফিরিতেছিল। চিন্তামণি তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কি রে জনাব, পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিস্ যে? খুব ক্ষিদে লেগেছে বুঝি?"

"হু—হু" করিয়া গরু থামাইয়া স্কন্ধস্থিত লাঙ্গলটা মাটীতে নামাইয়া গামছা দিয়া মাথার ঘাম মুছিয়া জনাবালি বলিল—

"কি ক'ব মুই বর্‌দা'—তোমাগোর উপ্‌রি মোর আগ্ হইছে।"

চিন্তামণি হাসিয়া বলিলেন—

"বলিস্ কিরে জনাবালি, আমার উপর তোর রাগ! কেন কি হয়েছে বল্ দেখি?"

"হ'ব আর কি বর্‌দা'! মুই ছুস্কু লোক কিনা, সেইতে ছাতুবাবুকে আর মোর কাছ্কে আস্‌তি দেও না। সেইতে মোর লয়ান কত ঝুরে গো বর্‌দা, তা' কি আপুনি বুইতে পার?"

চিন্তামণির হাসি বন্ধ হইয়া গেল। সত্যেন্দ্রকে জনাবালি বড়ই ভালবাসে—সে কথা চিন্তামণি বিলক্ষণ জানিতেন। সেই সত্যেন্দ্র যদি জনাবালির নিকট না যায়, তাহা হইলে জনাবালির দুঃখ ত হইবারই কথা। কিন্তু জনাবালির নিকট সত্যেন্দ্রের না যাওয়ার দরুণ দোষটা যে জনাবালি কেন তাঁহার স্কন্ধে চাপাইল, চিন্তামণি তাহা কিছুতেই স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। তাঁহার ললাট কুঞ্চিত হইল, নাসিকাগ্র-ভাগ ঈষৎ স্ফীত হইল। জনাবালিকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কে বলেছে জনাব, যে আমি সতুকে তোর কাছে আস্‌তে মানা করেছি?"

প্রশ্ন শুনিয়া জনাবালি কিছু গোলে পড়িল। যাহা সে কাহারও নিকট শুনে নাই, তাহা সে কেমন করিয়া "বড়দা'র" নিকট বলিতে পারে! সুতরাং তাহাকে চুপ্ করিয়াই থাকিতে হইল। কিন্তু চিন্তামণি ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—

"চুপ্ ক'রে রইলি যে জনাব ?"

অপ্রতিভ জনাবালি সপ্রতিভ হইবার উদ্দেশে অনেক কথা বলিয়া ফেলিল। তাহা হইতে চিন্তামণি বুঝিয়া লইলেন যে সতু পাঠশালা হইতে সোজা বাড়ী চলিয়া যায় ; তাহার পর জলযোগ করিয়া পীতাম্বরের "আড়তে" যাইয়া চুপ্টী করিয়া একটী কোণে বসিয়া থাকে। সেই কারণে জনাবালির বিশ্বাস—কর্ত্তার হুকুম না পাইলে—না হইলে—কি এমন ব্যাপার ঘটিতে পারে! সেইটাই ত জনাবালির বিশেষ দুঃখের কারণ।

চিন্তামণি, জনাবালিকে বুঝাইয়া দিলেন—তাহার দুঃখটা কাল্পনিক। এ বিষয়ের কোনও খোঁজখবরই তিনি রাখেন নাই, আর রাখেনও না। যাহা হউক, ভবিষ্যতে সত্যেন্দ্র যদি জনাবালির নিকট না যায়, তাহা হইলে জনাব তাহাকে "পাকৃড়াও" করিয়া লইয়া যাইতে পারে—এইরূপই তিনি আদেশ দিলেন। আদেশ শুনিয়া জনাবালি প্রীত হইল। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা খুঁজিয়া না পাইয়া জনাবালি উদাস নয়নে "বড়দা'র" দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। জনাবের হৃদয়-ভাব বুঝিতে চিন্তামণির আর বাকী রহিল না। চিন্তামণি, তাহার পিঠ্ চাপ্ড়াইয়া বলিলেন—

"যা' জনাব, এখন ঘরে যা'—তোর যে বড্ড ক্ষিদে, তা' তোর মুখ দেখে আমি বুঝ্তে পেরেছি। সতুর ব্যবস্থা আমি নিজেই ক'রব এখন।"

জনাবালি তখন হাঁপ্ ছাড়িয়া বাঁচিল। চিন্তামণিকে বারবার সেলাম করিয়া হাল গরু লইয়া জনাব গৃহাভিমুখে চলিয়া গেল। চিন্তামণিও বট্‌তলার দিকে চলিয়া গেলেন।

বাঁধা বট্‌তলার বৈঠক্ আজ ভারী জমিয়া গিয়াছে। বাঁড়ুয্যে, মুখুয্যে, চাটুয্যে, ঘোষ, মিত্র, দত্ত, মজুমদার, বক্সি, লস্কর, মিঞা, খাঁ সাহেব প্রভৃতি নানাবর্ণের নানা লোক সে স্থানে সমবেত হইয়া ভারী গোল করিতেছে। আজ বট্‌তলায় পঞ্চায়তের অধিবেশন—বিচার হইবে। সকলেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে—এখনও উপস্থিত হ'ন নাই কেবল চিন্তামণি। তাঁহার অপেক্ষায় এখনও বিচারকার্য্য আরম্ভ হয় নাই। সকলে বসিয়া গোল করিতেছে। সে গোলমালে কাহারও কথাই কেহ ভাল করিয়া শুনিতে পাইতেছে না। কথা শুনিবার বোধ হয় তাহাদের আবশ্যকও নাই—গোল করিয়াই তাহাদের আমোদ।

চিন্তামণি সেস্থানে আসিয়া পড়িতেই কিন্তু সমস্ত গোলমাল একেবারে থামিয়া গেল। গোলমাল থামিবার পূর্ব্বে সকলে কেবল একটু বেশী গোলমাল করিয়া বলিয়া উঠিল—'বড়দা' এসেছে, বড়দা' এসেছে, এইবার পঞ্চায়তের কায আরম্ভ হ'বে।"

পঞ্চায়তের বিচার আরম্ভ হইল। সে বিচারে কেহ জাতিতে উঠিল, কাহারও ধোপা নাপিত বন্ধ হইল, কেহ অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইল, আর কাহারও কাহারও বা অর্থ আদায় করিয়া দিবার ব্যবস্থা হইল। পঞ্চায়তটা নামে—বিচারকর্ত্তা কিন্তু বড়দা' একাই। সকলেরই ধারণা—বড়দা' যাহা করেন, তাহা কিছুতেই অন্যায় হইতে পারে না—কারণ বড়দা' সত্যপ্রিয় এবং তিনি সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া থাকেন। গ্রামের লোকের এমন ধারণা—দেবই হউন্ আর গন্ধর্ব্বই হউন, কৃষ্ণই হউন আর বিষ্ণুই হউন, সুরেশই হউন আর জলেশই হউন, নগেন্দ্রই

হউন আর পাতালেন্দ্রই হউন, বিনয়ের অবতারই হউন আর অবিনয়ীই হউন, মুনীন্দ্রই হউন আর বিলাসেন্দ্রই হউন, সুশীলই হউন, আর দুঃশীলই হউন—বড়্দা'র বিচারের নিকট কাহারও আর রক্ষা নাই। যাহা সত্য, বড়দা'র নিকট তাহা বরণীয়; যাহা অসত্য, তাহা বর্জ্জনীয়।

বিচারকার্য্যাদি শেষ করিয়া সকলে আবার একটু গোলমাল করিতে বসিল। যাহাদের যাহা স্বভাব, তাহারা তাহা ছাড়িবে কেমন করিয়া? তবে গোলটা তাহারা আর তত বেশী করিল না—কারণ, বড়দা' তখনও যে সে স্থানে উপস্থিত।

পাঠশালার গুরুমহাশয় নফরচন্দ্র জোৎদারও সেই জনারণ্যে উপস্থিত ছিল। চিন্তামণি কাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কেমন জোত্দার, তোমার মাইনে কড়ি পাচ্ছ ত?"

জ্যোত্দার একটু কাব্যপ্রিয়। সে কবিতা করিয়া বলিল—

জ্যোতি আছে খদ্যোতের,
কিরণ কোথায় তা'র;
অরুণ রবির রথে,
তবু তাঁ'রে আঁটা ভার।

অর্থাৎ বড়দা', আমি বেতন পেয়েছি।"

চিন্তামণি হাসিয়া বলিলেন—

"কবিতার অর্থের সঙ্গে পাঠশালের বেতনের কি সম্বন্ধ, সেটা ত ঠিক্ বুঝে উঠ্তে পারলেম্ না জোত্দার!"

গুরুমহাশয় খুব গম্ভীর হইয়া বলিতে লাগিল—

"বুঝ্লেন না বড়দা', এই পীতুবাবু হাজার কর্ত্তা হ'লেও তিনি এখনও বাপের ভাতে আছেন। তাঁ'র কর্ত্তাত্তির আর মূল্য কি? আপনি হলেন সূর্য্য সদৃশ দীপ্তিমান। আপনার আদেশ কি কেউ চেপে রাখতে

পারে ? আপনি আদেশ করতেই আমি বেতন পেয়েছি, আর ভবিষ্যতে পাওয়ার বিষয়েই নিশ্চিন্ত আছি।"

"কি সর্ব্বনাশ—তোমার কবিতার এত অর্থ! তুমি না ব'লে দিলে ত কা'রও সাত্ সাত্তে ঊনপঞ্চাশ পুরুষেরও বোঝ্বার ক্ষমতা নেই। বলি হাঁ হে, প্রাচীন কবিদের অনেক কবিতাই ত আমার কণ্ঠস্থ আছে। পড়্লেই ত'ার অর্থ কর্তে পারি—অর্থ বুঝ্তে পারি। কিন্তু তোমার এ কবিতা কেমন বল দেখি—কবি স্বয়ং অর্থ না ক'রে দিলে অর্থ বোঝা যায় না!"

জোত্দার গর্ব্বিতভাবে কহিল, আজকালের ধারাই হচ্ছে ঐ। কবিতার অর্থ যত অস্পষ্ট হ'বে, যত অর্থহীন হ'বে, অর্থশূন্য শব্দের যত ঝঙ্কার থাক্বে, ততই হচ্ছে ভাল কবিতা। তবু বড়্দা'—এখনও বলি নি—

যত বিলোল নিচোল
নীরদ মালা,
দুলিত দুলু দুলু
অম্বর শালা;
লট পট লম্বিত
লম্ফন সার,
ঝট পট ঝঞ্ঝা
টিপু রিপু তা'র।

অর্থাৎ—"

"থাক্ তোমার অর্থাৎ। বাড়ী গিয়ে অন্ততঃ চার ঘটী জল না খেলে আর তোমার 'অর্থাৎ' শুন্তে পা'রব না। এই "টিপু রিপুর" যন্ত্রণাতেই আজকাল অনেক ভাল কবিতারও আদর হয় না বটে!"

বড়দ'ার কথায় জোত্দার অত্যন্ত অপ্রতিভ হইল। সে লজ্জা হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য জোত্দার নির্লজ্জভাবে আর একটা কবিতার আবৃত্তি করিতে যাইতেছিল। চিন্তামণি তাহাতে বাধা দিয়া কহিলেন—

"থাক্ তোমার কবিতা। বল দেখি এখন, তোমার ছাত্র প'ড়্ছে কেমন? গুরুর মত শিষ্য কবিতা আবৃত্তি কর্‌তে শিখ্‌লেই ত আমার বাড়ীতে থাকা দায় হ'বে।

"আজ্ঞে, ছেলে খুব বুদ্ধিমান। তবে করে না কিছু—ভারী দুষ্ট।"

"হ্যাঁ হে নফর, এইত কথা কইছ বেশ—মানেও বোঝা যাচ্ছে বেশ। অথচ কবিতার সময় অমন—'দুলিত দুলু দুলু', 'টিপু রিপু' হ'য়ে পড় কেন বল দেখি? বয়সের দোষ বটে!"

"আজ্ঞে না—আমার চেয়েও যাঁদের বয়স বেশী, তাঁদের মধ্যে অনেকের কবিতাতেও ওসব পাবেন। তাঁ'দের দেখেই আমাদের শেখা।"

"তুমি ওসব কবিতের চর্চ্চা ছেড়ে দাও—না হ'লে পাঠশাল রাখার তোমার সুবিধে হ'বে না।"

"আজ্ঞে—"

"আজ্ঞে না—যা বল্‌ছি, তা ঠিক্ বল্‌ছি। অমন "দুলু দুলু" নিয়ে থাক্‌লে তোমার পড়ুয়ারা দুষ্ট হ'বেই ত। বল্‌লে ছেলে দুষ্ট— কেন, তোমার বেতের বহর কি ক'মে গেছে?"

"আজ্ঞে কতকটা তা'ই। মারি নে কেবল আপনার ভয়ে। ছেলে-দের বেত্ মার্‌তে আপনিই একদিন মানা ক'রেছিলেন—বলেছিলেন, বেত্ মার্‌লে ছেলে শাসন করা হয় না, তা'তে ছেলে আরও খারাপ হ'য়ে যায়।"

"বটে, বটে—ও কথাটা আমি ভুলেই গিয়েছিলেম। আচ্ছা, মার

ধরের আর দরকার নেই। কিন্তু বেত্ দেখাও না কেন? মা'রতেই না হয়, আমি মানা ক'রেছি—শাসন কর্‌তে ত মানা করি নে!"

"যে আজ্ঞা! এবার থেকে শাসন ক'রব। এক আধ্‌টা কাণমলা, কি গাধার টুপি, কি হাতের ওপর ইট্—এ সকলের ব্যবস্থা কর্‌তে পারি কি?"

"তা' পার—কিন্তু তা'তেও কাজ নেই। বাপ্ মা মরা ছেলে—আমার হাতে দিয়ে গেছে—ও সকলে আর কায নেই। তবে শাসন কোরো—চ'খ রাঙ্গিয়ো—তা' হ'লেই দুরস্ত হয়ে যা'বে।"

রাত্রির অন্ধকার বাড়িতেছে দেখিয়া বড়দা' সে রজনীর মত সভা ভঙ্গ করিয়া দিলেন। তখন সকলেই স্ব স্ব গৃহাভিমুখে চলিল। দুই একজন লোক 'হাত্‌বাতি' সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল। অন্ধকারে পথ চলায় কাহারও আর তেমন কষ্ট হইল না।

———•———

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সত্যেন্দ্রকে কোলের কাছে টানিয়া তাহার পিঠে হাত্ বুলাইতে বুলাইতে চিন্তামণি জিজ্ঞাসিলেন—

"কেন র‍্যা সতু, জনাবালির কাছে তুই আর যাস্ না কেন?"

সত্যেন্দ্র তাহার দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দন্ত পংক্তির ভিতর চাপিয়া ধরিয়া একটু ভারী গলায় কহিল—

"জনাব চাচার সঙ্গে আমার আড়ি হ'য়ে গেছে।"

সে কথা শুনিয়া চিন্তামণি হাসিয়া ফেলিলেন। হাসিয়াই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—

"আড়িটা হ'ল কেন সতু?"

বালক তাহার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ বদন-গহ্বর হইতে বাহির করিয়া চিন্তামণিকে বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখাইল। তৎপরে সে কহিল—

"কলা যা'বে। সেখানে গেলে দাদাভাই আমাকে মার্‌বে বলেছে। আমি আর সেখানে যাচ্ছি না বড়দা'। তা' তুমি যাই বল।"

চিন্তামণির হাস্যোৎফুল্ল মুখে চিন্তার রেখা পড়িল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—

"জনাবের বাড়ী গেলে তোর দাদাভাই কেন মার্‌বে সতু? জনাব তোকে ভালই বাসে; তোকে না দে'খ্‌লে সে থাকৃতে পারে না।"

মুখ বিকৃত করিয়া বালক কহিল—

"পারে না ত পারে না—আমি ত আর সেখানে যাচ্ছি না। গেলে দাদাভাই মার্‌বে।"

"কেন মা'রবে ?"

"দাদাভায়ের খুসী—দাদাভাই মার্‌লে তুমি কি রক্ষে কর্‌তে পার্‌বে ?"

চিন্তামণির মুখ আরও গম্ভীর হইল। ক্ষুণ্ণ ভাব গোপন করিয়া তিনি আবার বলিলেন—

"আর আমি যদি তোকে সেখানে যেতে বলি ?"

"তা'ও যা'ব না। তুমি ত আমায় মার না। তুমি আমাকে ভালবাস, আমিও তোমাকে ভালবাসি। ভালবাসলে বুঝি আবার ভয় থাকে ?"

পলকে বিদ্যুৎ চমকাইয়া আকাশের গায়ে যেমন মিলাইয়া যায়, হাসির বিদ্যুৎ চিন্তামণির মুখমণ্ডলে সেইরূপ চমকাইয়া মিলাইয়া গেল। বালককে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—

"তোর দাদাভাই কি তোকে খুব মারে ?"

"হুঁ—কাণ ম'লে দেয়, চড় বসিয়ে দেয়, চুল ধ'রে টানে, আবার ছিপ্‌টিও বসিয়ে দেয়।"

শিহরিত চিন্তামণি জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কেন মারে ?"

সত্যেন্দ্র হাত্‌মুখ নাড়িয়া বলিল—

"তা' কি ছাই আমি জানি !"

"পাঠশাল' থেকে এসে তুই আড়তে যাস্ কেন ? না গেলে তোকে ত আর মার খেতে হয় না !"

অঙ্গভঙ্গী সহকারে সত্যেন্দ্র কহিল—

"ওঃ, তুমি ত ভারী বল্‌লে বড়দা'। সেখানে না গেলে দাদাভাই আমার পিঠে চাবুক মা'রবে না ?"

"কেন—তোকে সেখানে কি কর্‌তে হয় ?"

বালক একটু ভাবিয়া চিন্তিয়া কহিল—

"অনেক কাজ সেখানে। এই—তামাক সাজ্‌তে হয়, ঘর ঝাড়্‌তে হয়, পান দিতে হয়, পাখা কর্‌তে হয়, জল দিতে হয়, পা টিপ্‌তে হয়, আরও কত কি কর্‌তে হয়, তোমায় কি ব'ল্‌ব গো বড়্‌দা! তুমি কি তা' পার্‌বে? আমি ছেলেমানুষ, তা'ই সব পারি। তুমি বুড়ো মানুষ, পার্‌বে কেন?"

চিন্তামণি আর কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। দক্ষিণ হস্তের উপর দক্ষিণ গণ্ড রাখিয়া তিনি বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। —সত্যেন্দ্র সেই অবসরে চিন্তামণির নিকট হইতে পলায়ন করিল। হরিহর চট্টোপাধ্যায়ের পঞ্চম বর্ষীয়া কন্যা নীহারিকা ঝড়ের মত আসিয়া কি একটা কথা তাহাকে ইঙ্গীতে বলিয়াছিল। সত্যেন্দ্রের পলায়ন সেই কারণে।

চিন্তামণি ভাবিতেছিলেন—ভাবিতেই লাগিলেন। অভয়াসুন্দরী ধীরে ধীরে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া স্বামীর গাত্রস্পর্শ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—

"সকাল বেলা গালে হাত দিয়ে কি ভাব্‌ছ?"

অভয়াসুন্দরীর মুখের দিকে চাহিয়া চিন্তামণি কহিলেন—

"একটু ভাব্‌তে হচ্ছে। পীতু আমায় বড়ই ভাবিয়ে তুলেছে।"

বিস্মিতা অভয়াসুন্দরী বলিল—

"কি, হয়েছে কি? পীতু তোমায় ভাবিয়ে তুলেছে কি রকম?"

"শুন্‌বে, শোন"—বলিয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত তিনি বর্ণনা করিলেন। বিস্ময়াবিষ্টা অভয়াসুন্দরী স্বামীর মুখপানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল মাত্র। বাঙনিষ্পত্তি করিবার অভয়াসুন্দরীর তখন বোধ হয় আর শক্তি ছিল না।

কিছুক্ষণ এই ভাবেই কাটিয়া গেল। চিন্তামণি তৎপরে জিজ্ঞাসা করিলেন—

“পীতু কোথায় ?”

“জল খাচ্ছে।”

“ডাক তা’কে।”

পীতাম্বর পিতৃসমীপে আগমন করিলে পিতৃদেব তাহাকে আদেশ করিলেন—সে যেন সতুকে “আড়ত-ঘরে” আর না লইয়া যায়। তিনি আরও বলিলেন,—তামাক সাজা, পাখা করা প্রভৃতি কার্য্যের জন্য লোক রাখার আবশ্যক হইলে, বেতনভোগী ভৃত্য রাখা যাইতে পারে। সে কার্য্য কোনও ভদ্র সন্তানের দ্বারা সম্পন্ন করান ভদ্রতা নহে।

পিতার আদেশ শুনিয়া পীতাম্বরের মুখ লাল হইয়া উঠিল। পিতৃদেবকে সে বুঝাইবার চেষ্টা করিল যে দুষ্ট সতুকে শাসন করিবার জন্যই “আড়তে” তাহাকে লইয়া যাওয়া হয়।

চিন্তামণি কহিলেন—সেরূপ শাসন করিবার অধিকার পীতাম্বরের নাই। সতুর লালন পালনের ভার তিনি স্বয়ং যখন গ্রহণ করিয়াছেন, শাসন করিবার ভার গ্রহণ করিতেও তিনি অক্ষম নহেন।

লজ্জিত পীতাম্বর আর কোনও কথা কহিতে পারিল না। পিতার নিকট সে ত্রুটী স্বীকার করিল বটে, কিন্তু মনে মনে সত্যেন্দ্রের মুণ্ডপাত করিতে পীতাম্বর দ্বিধাবোধ করিল না। অসূয়াপরবশ পীতাম্বর মনে মনে ভাবিতে লাগিল—সত্যেন্দ্রকে বাড়ী ছাড়া করিতে না পারিলে তাহার আর মঙ্গল নাই। পরের ছেলেকে অত্যধিক স্নেহাদর করিবার জন্য পীতাম্বর পিতার উপরও একটু অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু সে ভাব মুখে প্রকাশ করিতে তাহার সাহসে কুলাইল না। চিন্তামণি বড় শক্ত লোক। কথা-সাহিত্যে যাহাকে “চালাকী” বলে, সে জিনিসটা তাঁহার কাছে চালাইবার একেবারেই উপায় নাই।

———•———

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

একটা পেয়ারা গাছের সরু ডালের উপর দাঁড়াইয়া সত্যেন্দ্র পেয়ারা পাড়িতেছিল, আর বালকের দল পেয়ারা তলায় দাঁড়াইয়া হাঁ করিয়া সত্যেন্দ্রের কার্য্যকলাপ দেখিতেছিল। সকলেরই আশা—সকলেই কিছু কিছু সে পেয়ারার ভাগ পাইবে। কাহাকেও বঞ্চিত করিয়া যে সত্যেন্দ্র একা কোনও জিনিস খাইতে জানে না, এমন বিশ্বাস—এমন ধারণা সকলেরই ছিল। সুতরাং সেরূপ আশা করা বালকগণের পক্ষে অসঙ্গত হয় নাই।

বালকগণের সঙ্গে বালিকা নীহারিকাও ছিল। নীহারিকার প্ররো-চনাতেই সত্যেন্দ্র পেয়ারা গাছে পেয়ারা পাড়িতে উঠিয়াছে। সত্যেন্দ্র গাছে উঠিবার পর বালকদল পেয়ারাতলায় আসিয়া জুটিয়াছে এবং তীর্থের কাকের মত তাহারা দাঁড়াইয়া আছে। তাহাদের মধ্যে দুই একজনের এমন ইচ্ছাও হইয়াছিল যে গাছে উঠিয়া তাহারাও পেয়ারা সংগ্রহ করে। কিন্তু সত্যেন্দ্রের ভয়ে সে কার্য্যে অগ্রসর হইতে কাহারও সাহসে কুলাইল না। সত্যেন্দ্রের চপেটাঘাতকে দেশের বালক মাত্রেই ভয় করিয়া থাকে। সত্যেন্দ্রের সম্মুখে কোনও বালক মুরুব্বীয়ানা করিতে আদৌ সাহস করে না।

সত্যেন্দ্র কিন্তু কাহারও প্রতি অত্যাচার, অবিচার করিবার পাত্র নহে। সে সকলকেই আশা দিয়াছে—পেয়ারার ভাগ তাহারা সকলেই কিছু কিছু পাইবে। পেয়ারা ভাগের কথা শুনিয়া নীহারিকা তাহাতে কোনও আপত্তি করে নাই—তাহা করিলেই বা শুনিবে কে? সত্যেন্দ্রের হাত ভারী দরাজ।

পেয়ারা পাড়া অথবা পেয়ারা দিবার আশা দেওয়াটা সত্যেন্দ্রের পক্ষে যতটা সহজ ছিল, পেয়ারা গাছ হইতে নামিয়া আসিয়া পেয়ারা বিতরণ করাটা তাহার পক্ষে ততটা সহজ বোধ হইল না। কারণ—ছেলে জমিয়াছিল অনেক। কিন্তু পেয়ারা বিতরণ সত্যেন্দ্রকে করিতেই হইবে—প্রতিজ্ঞা করিয়া সে ত তাহা কিছুতেই লঙ্ঘন করিতে পারে না। সেরূপ করার প্রবৃত্তি তাহার প্রকৃতিতে নাই।

দুইটী পেয়ারা নীহারিকার জন্য বহু কষ্টে রাখিয়া অবশিষ্ট পেয়ারা বালকদিগের মধ্যে সত্যেন্দ্র ভাগ করিয়া দিল। একটী করিয়া পেয়ারা এক একজনের ভাগে পড়িয়াছিল। সে ভাগ পাইয়া অনেক বালকই সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই। নীহারিকার ভাগে দুইটী পেয়ারা পড়াই সে অসন্তোষের মূল কারণ।

সে যাহা হউক, যে যাহার ভাগ পাইয়া সকল বালকই স্ব স্ব গন্তব্য-স্থানে চলিয়া গেল। পেয়ারাতলায় বসিয়া রহিল মাত্র—সত্যেন্দ্র ও নীহারিকা। তাহারা অনেক সময়ে এমন করিয়াই বসিয়া থাকে।

সত্যেন্দ্র নীহারিকাকে কহিল—

"পেয়ারা খাবে না?" খাও না।

বামহস্তস্থিত পেয়ারা দুইটী দক্ষিণ হস্তে লইয়া নীহারিকা বলিল—

"তুমি খাও আগে।"

"না আমি খা'ব না; পেয়ারা খেলে আমার কি বলে—এঁ্যা, কি বলে—আমার গা চুল্‌কোয়।"

পেয়ারা খাইলে যে অনেকের পেট কামড়ায়, এমন কথা নীহারিকা তাহার পিতামাতার কাছে শুনিয়াছে। কিন্তু সে দ্রব্য ভক্ষণ করিলে যে কাহারও গা "চুল্‌কায়", এমন কথা সে কখনও শুনেও নাই আর বিশ্বাসও করিতে পারিল না। নীহারিকা, সত্যেন্দ্রের স্বভাব

জানিত। পাছে তাহার ভাগে কম পড়ে, সেই ভাবিয়াই যে সত্যেন্দ্র আপনার ভাগে একটী পেয়ারাও রাখে নাই এবং একটী পেয়ারাও খাইতে চাহিতেছে না, সে কথা বুঝিতে নীহারিকার আর বাকী রহিল না। পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীলোক অনেক কথাই অতি সহজে, অতি শীঘ্র বুঝিয়া থাকে। নীহারিকা অল্পবয়স্কা বালিকা হইলেও স্ত্রীলোক বটে ত! এই বয়সের বালক যাহা কিছুতেই বুঝিতে পারে না, এই বয়সের বালিকা তাহা সঙ্কেত মাত্রে বুঝিতে পারে। পুরুষ ত্রিশ চল্লিশ বৎসরে যাহা বুঝিতে পারে না, করিতে পারে না, চৌদ্দ পনের বৎসরের কিশোরী তাহা এক কথায় বুঝিয়া লয় এবং সেইমত কার্য্য করে। এ কথা অস্বীকার করিবে কে? তথাপি স্ত্রীলোক অবলা—অদৃষ্ট!

একটী পেয়ারা সত্যেন্দ্রের মুখের কাছে ধরিয়া নীহারিকা কহিল—

"খাও।"

বিনা আপত্তিতে সত্যেন্দ্র তাহার অর্দ্ধাংশ দন্তে কাটিয়া লইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া চর্ব্বণ করিতে লাগিল। নীহারিকাও "প্রসাদী" পেয়ারা ভক্ষণ করিয়া আপনাকে ধন্যা জ্ঞান করিল।

এই বালকবালিকার ভালবাসা অসামান্য। একটু বয়সে তেমন ভালবাসা হইলে, সে ভালবাসার যে কি নামকরণ করা যায়, তাহা কোনও পাঠক পাঠিকারই বোধ হয় অবিদিত নাই। কিন্তু সাত আট বৎসরের বালক আর পাঁচ ছয় বৎসরের বালিকাকে কি নায়ক-নায়িকার আসনে বসান যাইতে পারে!

জনাবালি ও তাহার বন্ধু কাশিম সেখ গল্প করিতে করিতে সেই পথ দিয়া যাইতেছিল। সত্যেন্দ্র ও নীহারিকাকে পেয়ারাতলায় বসিয়া থাকিতে দেখিয়া তাহারা দাঁড়াইয়া গেল। জনাব-চাচাকে দেখিয়া সত্যেন্দ্র পলায়নের চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু নীহারিকা তাহার সঙ্গে

ছিল বলিয়াই পলায়ন কার্য্যে সত্যেন্দ্রের সুবিধা হইল না। জনাবালির দিকে চাহিয়া সত্যেন্দ্র চুপ্ করিয়া বসিয়া রহিল। নীহারিকার অবস্থাও সেইরূপ।

জনাবালি, সত্যেন্দ্রের নিকটে যাইয়া তাহার হস্ত ধারণ করিয়া কহিল—

"মোর্ উপ্রি আগ্ হইছে ক্যানে ছাতুবাবু ?"

সত্যেন্দ্র সে প্রশ্নের কোনও উত্তর করিল না। জনাবালি বলিতে লাগিল—

"হা ত্থাথ ছাতুবাবু, বর্দা' হুকুমড়া কি দিছে জান ? বর্দা' কইয়ে দেছে, ছাতুবাবু যদি জনবালি মিঞার ঘর্কে যাবা ত যাবা। না যা'বা ত ধইরে নে যাবা।"

বড়্দা'র হুকুমের কথাটা জনাবালি অবশ্য ব্যাকরণ শুদ্ধ করিয়া বলিতে পারিল না। কিন্তু তাহাতে বড়্দা'র হুকুমের মর্ম্মটা বুঝিতে সত্যেন্দ্রের বিলম্ব ঘটিল না।

ধরিয়া লইয়া যাইবার কথা শুনিয়া নীহারিকা কাঁদিয়া ফেলিল। সত্যেন্দ্রের হস্ত ধরিয়া সে কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল—

"আমি বাড়ী যা'ব, আমি মা'র কাছে যা'ব।"

"চল"—বলিয়া নীহারিকার হস্ত ধরিয়া খুব মুরুব্বীয়ানা ভাবে সত্যেন্দ্র বাটী অভিমুখে যাত্রা করিবার উপক্রম করিল। জনাবালি তাহাতে বাধা দিয়া কহিল—

"তা' হ'ব না ছাতুবাবু। মোর ঘর্কে পইলে চল; এড্ডা আতা কি অন্তা কিছু খাবা, তা'র পল্কে বারী যাবা।"

আতা এবং রম্ভার কথা শুনিয়া নীহারিকার ক্রন্দন থামিয়া গেল। তাহার পরে যখন সে দেখিল, জনাবালিকে দেখিয়া সত্যেন্দ্র একটুও

ভয় পাইতেছে না, এবং জনাবালিও আর ধরিয়া লইয়া যাইবার কথা মুখে আনিতেছে না, তখন তাহার সাহস বাড়িয়া গেল। জনাবালির মিষ্ট কথায় এবং মিষ্ট ব্যবহারে নীহারিকার ভয় একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। তখন তাহার জনাবালির সহিত জনাবালির বাটীতে যাইতে আর কোনও আপত্তিই রহিল না। সে ইচ্ছা করিয়াই তখন জনাবের বাটীতে যাইতে চাহিল। তখন সত্যেন্দ্রেরও জনাবালির সহিত আড়া-আড়ি ভাবটা ঘুচিয়া গেল—আবার তাহাদের পরস্পরের ভাব হইল।

আপোষ—মিট্‌মাট্‌ যখন হইয়া গেল, তখন জনাবালি তাহার স্নেহের পাত্রকে সহজেই স্কন্ধে তুলিবার অধিকার পাইল। জনাবালির আজ ভারী আনন্দ—ছাতুবাবুকে সে ত ফিরিয়া পাইয়াছেই। তাহার উপর সে "ফাউ" পাইয়াছে—নীহারিকাকে। ছোট ছোট বালকবালিকাদের সহিত মিশিতে পাইলে জনাবালির ভারী সুখ হয়—ভারী আনন্দ হয়।

কাশিম সেখ, জনাবালির ভালবাসার ঘটা দেখিয়া প্রথমে বিস্মিত হইল, তৎপরে রাগিয়া গেল। কাশেম সেখ কহিল—

"কাফেরের পুত্র কন্যাদের এতটা ভালবাসিলে "গুণা" হয়। তাহা-দের ভালবাসিবার আবশ্যকতাই বা কি, তাহাও সে বুঝিয়া উঠিতে পারে না।

জনাবালি তখন হাসিতে হাসিতে তাহার বন্ধুকে বুঝাইয়া দিল—শিশুকে ভালবাসায় জাতিবিচার থাকা উচিত নহে। আর হিন্দু কিছু-তেই কাফের নহে। জনাব মুন্সীয়ানা করিয়া কাশেমকে বুঝাইতে লাগিল যে এক ধাত্রীর দুইটী স্তন যদি বিভিন্ন জাতীয় দুইটী, শিশু পান করে, তাহা হইলে তাহারা "দুধ্‌-ভাই" হয়। ভারতমাতার স্তন্য পান করিয়া, শস্যশালিনী রত্নময়ী দেশমাতৃকার সর্ব্বসম্পদে অধিকারী হইয়া হিন্দু ও মুসলমান বহুকাল যাবৎ এই দেশে বসবাস করিতেছে; ক্ষেত্রজাত

শস্যে, বৃক্ষজাত ফলমূলে, নদীতড়াগের সুমিষ্ট জলে পরিপুষ্ট হইতেছে। তাহারা এক মায়ের সন্তান, এক ধাত্রীর স্নেহাদরে লালিত পালিত। সুতরাং হিন্দু আবার কাফের কোথায় ?

জনাবালির তর্কযুক্তি শুনিয়া কাসেম সেথ পরাজয় স্বীকার করিল। সেই মুহূর্ত্তে কাশেম প্রতিজ্ঞা করিল—হিন্দুকে সে আর কাফের বলিবে না, হিন্দুকে সে মাথায় করিয়া রাখিবে, হিন্দুর সহিত সে মিলিয়া মিশিয়া চলিবে।

জনাবালি, কাশেমকে আরও বুঝাইয়া দিল যে হিন্দু ভারি উদার জাতি, কাহাকেও ঘৃণা করা হিন্দুর স্বভাব নহে, হিন্দুর ধর্ম্ম নহে।

"দেশের বড়দা'কে দেখাইয়াও জনাবালি অনেক কথা বলিল। সেইদিন হইতে কাশেম সেথ, জনাবালির পন্থাই অনুসরণ করিল। হিন্দুকে এখন কাশেম জনাবালির মতই শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া থাকে।

সত্যেন্দ্র ও নীহারিকা এতক্ষণ জানাবালি ও কাশেম সেখের কথাবার্ত্তা অবাক হইয়া শুনিতেছিল। কথাবার্ত্তার মর্ম্ম অবশ্য তাহারা বিশেষ কিছুই বুঝিতে পারে নাই। তবে জনাবালি যে সত্যেন্দ্র ও নীহারিকাকে খুব বেশী ভালবাসে এবং সেই ভালবাসার কথা লইয়াই যে কাশেম সেখের সহিত সে ঝগড়া করিতেছিল, তাহা তাহারা বুঝিতে পারিয়া খুব আনন্দিত হইল। জনাবালির স্কন্ধদেশ অধিকার করিয়া বসিয়াছিল সত্যেন্দ্র; আর জনাবের হস্তধারণ করিয়াছিল নীহারিকা। সেই ভাবেই তাহারা—জনাবালির বাটীতে উপস্থিত হইল। আতা ও রম্ভা ভক্ষণ করিয়া তাহারা ছুটী পাইল। জনাবালির সেদিন আনন্দের আর সীমা রহিল না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ।

পীতাম্বর কোনও প্রকারেই সত্যেন্দ্রকে জব্দ করিতে না পারিয়া সত্যেন্দ্রের উপর অধিকতর "চটিয়া" গেল। মানুষের স্বভাবই ঐরূপ। যে যাহাকে পদানত করিতে চায়, সে পদানত হইলে প্রতিহিংসা-পরায়ণ ব্যক্তির রাগ অনেক সময়ে পড়িয়া যায়—অন্যথায় তাহার ক্রোধ ও প্রতি-হিংসা প্রবৃত্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

পীতাম্বরের প্রহার যখন বন্ধ হইল, সত্যেন্দ্র তখন বুঝিয়া ফেলিল যে তাহাকে শাসন করিতে এ সংসারে বড় একটা কেহ নাই। সুতরাং দুঃসাহস তাহার বাড়িয়াই গেল—তাহার দুষ্টামীর জ্বালায় গ্রামের লোকের বাস করা তখন দায় হইয়া উঠিল। কাঁচা পাকা ফল, পাখির ছানা প্রভৃতি গাছ হইতে পাড়া তাহার ত নিত্যকর্ম্ম ছিলই; সেই কর্ম্মটা এখন হইতে সে দ্বিগুণ উৎসাহে করিতে লাগিল। তাহার সে কর্ম্মে বাধা প্রদান করিলে কাহারও আর রক্ষা থাকিত না। গ্রামের লোককে সে অত্যাচার কতকটা নীরবেই সহ্য করিতে হইত। তাহা করা ভিন্ন তাহাদের আর উপায় কি? সত্যেন্দ্রকে কেহ কিছু বলিলে "দেশের বড়দা' যে ব্যথিত হ'ন।

কিন্তু তাহার দুষ্টামীর মাত্রা যখন ক্রমে বাড়িতেই লাগিল, তখন দেশের লোক আর চুপ্ করিয়া থাকিতে পারিল না। সকল কথা 'বড়দা'র কর্ণগোচর তাহাদের করিতেই হইল। সে সকল কথা তাঁহাকে শুনাইবার জন্য পীতাম্বরই দেশের লোককে পরামর্শ দিয়াছিল। পরামর্শ-দাতার নামটা অবশ্য কিছুতেই প্রকাশ পাইল না—কারণ সে বিষয়ে পরামর্শদাতার বিশেষ নিষেধ ছিল।

চিন্তামণি প্রথম প্রথম যখন সত্যেন্দ্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ শুনিতেন, তখন তিনি সকলকে ডাকিয়া বলিতেন—"দেখ গা, ওটা বাপ্-মা মরা ছেলে, ওকে শাসন করা শুধু আমার পক্ষে কেন, তোমাদের সকলের পক্ষেই কঠিন ব্যাপার। তা,' একটু বড় হ'লেই ওর সকল দোষ সেরে যা'বে। ওর দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ ক'রে তোমাদের সকলকেই একটু সহ্য ক'র্‌তে হ'বে বাপু।"

"দেশের বড়দা"র মিষ্ট কথায় দেশের লোককে দুর্দ্দান্ত বালকের উৎপাত উপদ্রব সহ্য করিতেই হইত। কিন্তু মানুষের সহ্যের একটা সীমা আছে। সে সীমা অতিক্রম করিতেই দেশের লোক আবার দেশের বড়্দা"র নিকট উপস্থিত হইয়া কাতরভাবে জানাইল যে "বাপ্-মা মরা ছেলেটীর" উপদ্রবে দেশে বাস করা সকলের পক্ষে প্রায় এক প্রকার অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বড়্দা' যদি তাহাকে শাসন করিতে না পারেন, তাহা হইলে তাহার শাসনভার দেশের লোককেই গ্রহণ করিতে হইবে।"

এতদিনে চিন্তামণির চমক ভাঙ্গিল। জোত্‌দারকে ডাকিয়া পাঠাইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—

"হ্যাঁ হে জোত্‌দার, তোমাকে যে ছেলে শাসন কর্‌তে বলেছিলেম্, সেটা করা হয় নাই কেন ?"

"বড়্দ"ার প্রশ্নের উত্তরে জোত্‌দার একটা কবিতা আবৃত্তি করিতে যাইতেছিল। চিন্তামণি ধমক দিয়া কহিলেন—

"রাখ তোমার হেঁয়ালী আর রাখ তোমার টিপু-রিপু। তোমার পড়ুয়ার টিপু-রিপু-গিরিতে যে দেশের লোকের তিষ্ঠান ভার হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। তা'র তুমি কি ক'রছ বল ?"

জোত্‌দার একটু বিপদে পড়িল। ছাত্র পাঠশালায় আসিলে ত

গুরুমহাশয় তাহাকে শাসন করিতে পারে! ছাত্র যখন সে পাঠ একে-বারেই উঠাইয়া দিয়াছে, তখন তাহাকে শাসন করা কিরূপে সম্ভব? অথচ জোত্‌দার মাসে মাসে ছাত্রের মাহিনা আদায় করে, মাঝে মাঝে সিধাটা আস্‌টা লইয়া যায়। সুতরাং জোত্‌দারকে একটু গোলে পড়িতে হইল বৈকি! গোলে পড়িয়া গুরুমহাশয় চুপ্‌ করিয়া রহিল। চিন্তামণি বলিলেন—

"তুমি তবে ওকে শাসন কর না বটে!" জোত্‌দারকে এইবারে মৌনব্রত ভঙ্গ করিতে হইল। প্রশ্নের পর প্রশ্ন শুনিয়া চুপ্‌ করিয়া থাকাটা তাহার বিবেচনায় আর ভাল মনে হইল না। জোত্‌দার কহিল—

"আজ্ঞে, ও ছেলে—শাসনের বাইরে। ও রীতিমত পাঠশালে আসেও না, আর ওর জন্যেই আমার অন্যান্য ছাত্র খারাপ হ'তে বসেছে।"

চিন্তামণি ভ্রূকুটী করিয়া কহিলেন—

"সে কথা এতদিন আমাকে বলা হয় নি কেন?"

"আজ্ঞে—আজ্ঞে—ভয়ে।"

"এখন নির্ভয়ে বল্‌ছ কেমন? দোষটা অবশ্য আমারই। আমার অনেক দিন পূর্ব্বেই বোঝা উচিত ছিল, যা'রা—'ঢিপু-রিপু'র কবিতে নিয়ে ব্যস্ত থাকে, তা'দের দিয়ে ছেলে পড়ান হয় না।"

"আজ্ঞে—"

"আর আজ্ঞে নয়। আজ থেকে সতুর পাঠশালে যাওয়া বন্ধ ক'রে দিলেম্‌। তুমি এখন যেতে পার। বৈকাল বেলায় বট্‌তলায় তুমি হাজির হ'বে। তোমাকে শাসন কর্‌বারও কিছু প্রয়োজন হ'য়ে পড়েছে।"

কথা সমাপ্ত করিয়াই চিন্তামণি বাটীর ভিতর চলিয়া গেলেন।

জোত্‌দার বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল, এ আকস্মিক বিপদ হইতে কিরূপে পরিত্রাণ লাভ করা যায়! ভাবিয়া-চিন্তিয়া জোত্‌দার স্থির করিল—অভয়াসুন্দরীর আশ্রয় গ্রহণ করা ভিন্ন সে বিপদে মুক্তিলাভ করিবার আর দ্বিতীয় উপায় নাই।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

চিন্তামণি খুবই রাগিয়াছিলেন—এমন রাগ তাঁহার কখনও হয় নাই। রাগ ছাড়া আরও একটা জিনিস তাঁহাকে পাগল করিয়া তুলিয়াছিল। সে জিনিসটা—অভিমান। দেশশুদ্ধ লোক পিতৃমাতৃহীন সতুর বিরুদ্ধে নানারূপ অভিযোগ করিতেছে—ইহাই হইল তাঁহার অভিমানের কারণ। অভিমানটা অবশ্য দেশের লোকেরই উপর।

বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া চিন্তামণি শুনিলেন, সতু সেখানে নাই। পীতাম্বরের শিশুপুত্র নীলাম্বরের পৃষ্ঠদেশে "কুল-ডালের" ছড়ি মারিয়া সে কোথায় পলায়ন করিয়াছে—নীলাম্বরের ক্ষত স্থান দিয়া রক্ত পড়িতেছে। তবে আঘাত সামান্য—কুল-কাঁটার কয়েকটা আঁচড় লাগিয়াছে মাত্র। পীতাম্বর সেই স্থানে দাঁড়াইয়া তাহার জননী অভয়া-সুন্দরীকে বুঝাইতেছিল যে এরূপ ডাকাত-ছেলে বাড়ীতে থাকিলে একদিন খুনও যে না হইতে পারে তাহাই বা কেমন করিয়া বলা যায়!

মাতা, পুত্রকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া বলিতেছিলেন—সতু ছেলে-মানুষ। ছেলেমানুষে ছেলেমানুষে ঝগড়া বিবাদ করিয়া কে কি করিয়াছে, সে কথা লইয়া পীতাম্বরের মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন কি? যিনি শাসন করিবার, তিনি সতুকে শাসন করিবেন—সে কথায় পীতাম্বরের কথা কহিবার আবশ্যক নাই।

চিন্তামণি সে স্থানে আগমন করিতেই মাতা-পুত্রের কথোপকথন বন্ধ হইয়া গেল। নীলাম্বর কেবল কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিয়া উঠিল—

"দাদু বদাই, ছতুকা আমাকে মেলেছে। এই দেখ না, আমাল লক্ত পল্‌ছে।"

দেশের লোক চিন্তামণিকে বড়্‌দা' বলিত। কাজেই নীলাম্বরও তাঁহাকে সেই নামে ডাকিতে শিখিয়াছে। তবে বড়্‌দা' বলিতে না পারিয়া সে "বদাই" বলে, আর—"বদাই" এর পূর্ব্বে—"দাদু" কথাটী যোগ করিয়া দেয়। নীলাম্বরের এ যোগশিক্ষা অবশ্য তাহার জননীর শাসনে।

নীলাম্বরের অভিযোগ শুনিয়া চিন্তামণি তাহাকে আদর করিয়া কহিলেন—

"কেন নীলু ভাই, সতু তোমায় মা'রল কেন? তুমি কি করেছিলে দাদা?"

পিতার সে প্রশ্ন শুনিয়া পীতাম্বর মনে মনে ভাবিতে লাগিল—ঐরূপ আদর সোহাগ পাইয়াই ত বাপ্‌-মা খাওয়া ছেলেটা মাথায় উঠিয়াছে। নতুবা নীলাম্বরের অঙ্গে হাত তুলিতে কি তাহার সাহস হইত? সে আরও ভাবিতে লাগিল—পিতার বিবেচনাটা আচ্ছা যা' হ'ক্‌। তিনি আবার নীলুকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, সেই হতভাগা ছোঁড়া কেন "মা'রল!"

পীতাম্বরের মনের কথা মনেই রহিল। অভয়াসুন্দরী ইতিমধ্যে বলিয়া ফেলিলেন—

"নীলু ঝগড়া ক'রে সতুর কাণ কাম্‌ড়ে দিয়েছিল, তাই সতুও ত'ার পিঠে কুল-ডালের ছড়ি মেরে আঁচড় পাড়িয়ে দিয়েছে।"

নীলাম্বর সে কথা অবশ্য কিছুতেই স্বীকার করিতে চাহিল না। সে তাহার পিতামহকে বুঝাইতে প্রয়াস করিল যে "ছতুকা" তাহার আপনার কাণ আপনি কাম্‌ড়াইয়াছে। বালকের সে কথা শুনিয়া সে

স্থানে যাহারা উপস্থিত ছিল, তাহারা সকলেই হাসিয়া ফেলিল। পীতাম্বরও না হাসিয়া থাকিতে পারিল না।

চিন্তামণি, পৌত্রকে আদর করিয়া বলিলেন—"সতু কেমন ক'রে—তা'র নিজের কাণ নিজে কাম্‌ড়েছিল, তা' তুমি দেখিয়ে দাও ত দাদা!"

নীলাম্বর বদন ব্যাদান করিয়া নানা ভঙ্গীতে আপানার কাণ আপনি কামড়াইতে অশেষ প্রকারে চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া বালক চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে বলিল—

"সে পালে, আমি পালি না, দাত্ন বদাই।" হাসির রোল আবার উঠিল। কিন্তু সে হাসি হাসিয়াও চিন্তামণির রাগ "পড়ে" নাই। সত্যেন্দ্রকে শাসন করিবার জন্য তিনি দৃঢ়সঙ্কল্প। তাহার অন্বেষণে তিনি লোক পাঠাইলেন।

অপরাধী শীঘ্রই ধরা পড়িল। সকলেই জানিত, একটা কিছু অন্যায় কর্ম্ম করিলেই জনাবালির বাটীতে সে আশ্রয় গ্রহণ করিত। সেই স্থান হইতে তাহাকে ধরিয়া আনা হইল। সত্যেন্দ্র "জনাবালি চাচার" বাড়ী হইতে কিছুতেই আসিতে চাহে নাই। জনাবালি সঙ্গে আসিতে তবে বালক তাহার সঙ্গে আসিয়াছে।

সত্যেন্দ্রকে সম্মুখে দাঁড় করাইয়া চিন্তামণি জিজ্ঞাসা করিলেন—

"তুই নীলুকে মেরেছিস্?"

"হাঁ।"

"দেশের লোকের জিনিসপত্র সব চুরি করিস্?"

"না।"

"তা'রা সে কথা বলে কেন?"

"জানি না।"

"পাঠশালে যাস্ না কেন?"

“ইচ্ছে।”

“পড়াশুনা করিস্ না কেন?”

“খুসী।”

বালকের “বেয়াদবী” চিন্তামণি আর কিছুতেই সহ্য করিতে পারিলেন না। একেই তাঁহার পূর্ব্বাবধি রাগ হইয়াছিল—তাহার উপর দুষ্ট বালকের এইরূপ কথাবার্ত্তা শুনিয়া তাঁহার আরও রাগ হইল। সত্যেন্দ্রের হস্ত-পদ বন্ধন করিয়া তিনি তাহাকে একটা অন্ধকার গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। সত্যেন্দ্র করুণ স্বরে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল—

“ও বড়্দা” ছেড়ে দাও বড়্দা’; ও বড়্দা’, আর ক’র্‌ব না বড়্দা’; ও বড়্দা’, এই বারটী ছেড়ে দাও বড়্দা’—তোমার পায়ে পড়ি বড়্দা’।”

সে করুণ-ক্রন্দনে চিন্তামণি কর্ণপাত করিলেন না। সত্যেন্দ্র তারস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। অন্ধকার গৃহ, আরসুলা, ইন্দুর প্রভৃতিকে সত্যেন্দ্র অত্যন্ত ভয় করে। বালকের কারাগৃহটী সেইরূপই ভয়াবহ স্থান। করুণ-ক্রন্দনে সত্যেন্দ্র “বড়্দা”র করুণা ভিক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু করুণাময় চিন্তামণির সেদিন আর করুণার উদ্রেক হইল না। সত্যেন্দ্রের মুক্তির জন্য অভয়াসুন্দরী স্বামীকে অনেক সাধ্য-সাধনা করিলেন; জনাবালি অনেক অনুনয়, বিনয়—সেলাম করিল। কিন্তু চিন্তামণি সেদিন সত্যেন্দ্রকে মুক্তিদান করিতে কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন না। অভিমান ভরে তিনি তাঁহার স্নেহের সামগ্রীকে আজ শাসন করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছেন। তাঁহার রাগ কি আজ সহজে “পড়ে”!”

সত্যেন্দ্রের শাস্তি দেখিয়া পীতাম্বর মনে মনে খুবই আনন্দানুভব করিতেছিল। তাহার এমন ইচ্ছাও হইতেছিল যে, পিতা তাহার

পৃষ্ঠদেশে জল-বিছুটী মারিবার ব্যবস্থা করেন। সে ব্যবস্থা হইল না দেখিয়া পীতাম্বর মনে মনে কিছু ক্ষুণ্ণ হইল।

পীতাম্বরের পুত্র নীলাম্বর কিন্তু "ছতুকা'র মুক্তির জন্য ওকালতী আরম্ভ করিল। সে কহিল—

"দাদু-বদাই, ছতুকা'কে ছেলে দাও। ওযে বদ্দ কান্‌ছে দাদু-বদাই!"

চিন্তামণি আর থাকিতে পারিলেন না। সত্যেন্দ্রকে মুক্তি দান করিয়া তিনি বহির্ব্বাটীতে চলিয়া গেলেন। সেদিন সমস্ত দিন তিনি জল-বিন্দুও স্পর্শ করিলেন না—কাজেই তাঁহার সংসারের প্রায় সকলকেই সেদিন উপবাস করিতে হইল। বাড়ীর কর্ত্তা উপবাসে থাকিলে বাড়ীর অন্যান্য লোক অন্ন গ্রহণ করে কেমন করিয়া!

———o———
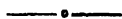
নবম পরিচ্ছেদ।

গ্রামের লোক যখন শুনিল, "দেশের বড়্দা" সত্যেন্দ্রকে শাসন করিতে যাইয়া সমস্ত দিন অনাহারে আছেন—একবিন্দু জলও কেহ তাঁহাকে স্পর্শ করাইতে পারে নাই, তখন সকলেই দুঃখিত হইল—অনেকে "বড়দা'র" বাড়ীতে আসিয়া তাঁহাকে আহার করাইতে চেষ্টা করিল। কিন্তু চিন্তামণি কিছুতেই তাহাদের অনুরোধ রক্ষা করিতে চাহিলেন না। চিন্তামণি বলিলেন—পিতৃমাতৃহীন সত্যেন্দ্রের অঙ্গে যখন তাঁহাকে হাত তুলিতে হইয়াছে, তখন অনাহারই তাঁহার পক্ষে প্রায়শ্চিত্ত!

সত্যেন্দ্রকে চিন্তামণি প্রহার করেন নাই—তাহাকে ধরিয়া ঘরে আবদ্ধ করিয়াছিলেন মাত্র। চিন্তামণির মতে তাহাও বোধহয় "অঙ্গে হাত্‌তোলা।" যিনি কখনও কাহাকেও একটা রূঢ় বাক্য পর্য্যন্ত বলিতে জানেন না, তাঁহার পক্ষে এইরূপ "ধরা" এবং "গৃহমধ্যে আবদ্ধ করা" একটা খুব কঠিন ব্যাপার বৈকি?

চিন্তামণি সে কঠিন কার্য্য করিয়াছিলেন—কেবল দেশের লোকের উপর অভিমান করিয়া। "বড়্দা"র সে অভিমান বুঝিতে দেশের লোকের আর বাকী রহিল না। যাহারা সে সময়ে সেস্থানে উপস্থিত ছিল, তাহারা সকলেই স্বীকার করিল যে সতুর বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া তাহারা ভাল কায করে নাই। এমন কর্ম্ম তাহারা যে আর কখনও করিবে না, তাহাও তাহারা অঙ্গীকার করিল। তাহারা আরও বলিল,

যে সতু শিশু মাত্র—তাহার বিরুদ্ধে দেশের লোকের ধর্ম্মঘট করা কিছুতেই শোভন হয় নাই।

যাহারা সতুর বিরুদ্ধে পাঁচকথা কহিয়াছিল, তাহারা—যখন স্ব স্ব ত্রুটী স্বীকার করিল, তখন চিন্তামণির অভিমানানলে শান্তি-জল পড়িল। আহার করিবেন—স্বীকার করিয়া মিষ্টকথায় তিনি দেশের লোককে বিদায় দিলেন। দেশের লোকের এমন ভক্তি-শ্রদ্ধার পাত্র হইতে হইলে, দেশের লোকের উপর এমন অভিমান করিবার যোগ্যতা লাভ করিতে হইলে যে কত সাধনাই করিতে হয়, কত স্বার্থই যে ত্যাগ করিতে হয়, কত লোকের সেবা শুশ্রূষাই যে করিতে হয়,—তাহা ভাবিবার জিনিস—শিখিবার জিনিস। ফাঁকা কথায়, ফাঁকা কাযে দেশপূজ্য হইবার চেষ্টা করিলে সে চেষ্টা ফলবতী হয় না। কিন্তু সে কথা সকলে বুঝে কি ?

বেলা প্রায় পড়িয়া গিয়াছিল। তখনও চিন্তামণি, অভয়াসুন্দরী প্রভৃতি কাহারও জলগ্রহণ করা হয় নাই। সেদিন উপবাসের পালা অনেকেরই, যথা—চিন্তামণির পুত্রবধূ তরুলতা এবং দাসদাসীগণ। পীতাম্বর যথাসময়ে আহারাদি করিয়া "আড়তে" চলিয়া গিয়াছিল ; আর নীলাম্বর ত দুগ্ধপোষ্য শিশু—তাহাকে ত খাইতেই হইবে। তরুলতা জোর করিয়া সত্যেন্দ্রকে কিছু জলযোগ করাইয়াছিল। সুতরাং তাহাকেও আর উপবাসী শ্রেণীভুক্ত করা চলে না। তবে সত্যেন্দ্র অন্ন আহার করে নাই। সে বিষয়েও তরুলতা যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু অভিমানদৃপ্ত বালক তরুলতার সে অনুরোধ রক্ষা করে নাই।

সত্যেন্দ্র ফুলিয়া ফুলিয়া অনেক কাঁদিয়াছিল। তরুলতা না বুঝিয়া নীহারীকাকে সে স্থানে আনয়ন করায় বালকের অভিমান ও ক্রন্দন অধিকতর বর্দ্ধিত হইয়াছিল। সুতরাং অন্নগ্রহণে তাহার আর কিছুতেই রুচি হইল না। সত্যেন্দ্রের জলযোগটা নীহারিকা আসিবার পূর্ব্বেই

সম্পন্ন হইয়াগিয়াছিল। নতুবা সে কার্য্যও হয়ত তাহার সেদিন হইত না। ক্রোধ কিম্বা অভিমানভরে কেহ উত্তেজিত হইলে, ক্ষুধা তৃষ্ণা কি আর কাহারও থাকে ?

সন্ধ্যার পর বাটী ফিরিয়া আসিয়া পীতাম্বর যখন শুনিল যে তাহার পিতা, মাতা, স্ত্রী প্রভৃতির কাহারও সেদিন আহার হয় নাই, তখন সে বিশেষ লজ্জিত ও দুঃখিত হইল। একটা ছেলে-শাসনের ব্যাপার লইয়া যে এতটা কাণ্ড ঘটিতে পারে, সে কথা সে পূর্ব্বে ভাবিয়া উঠিতে পারে নাই। সেই কারণে সে নিয়মমত আহারাদি করিয়া আপনার ব্যবসায়-স্থানে চলিয়া গিয়াছিল। বাটী ফিরিয়া আসিয়া যখন সে সকল কথা শুনিল, তখন ত তাহার লজ্জিত হইবারই কথা। কারণ সে ভিন্ন সেদিন সে বাটীতে সকলেরই যে প্রায় অনাহার।

সেজন্য পীতাম্বরকে কিন্তু খুববেশী দোষী করা চলে না। পীতাম্বরের ধারণা ছিল—সতুকে শাসন করিলেও তাহার জনকজননীর আহার সম্বন্ধে কিছুতেই ব্যতিক্রম ঘটিবে না। আরও এক কথা—এমন কিছু কাণ্ড ঘটে নাই, যাহাতে বাটীর কর্ত্তা আহার বন্ধ করিতে পারেন। কিন্তু অসম্ভব সম্ভবে পরিণত হইয়াছে দেখিয়া পীতাম্বর মনে করিল— পিতা তাহারই উপর রাগ করিয়া সেদিন অনাহারে আছেন। আর তিনি উপবাসী আছেন বলিয়াই সংসারের অন্যান্য সকলেরও সেদিন উপবাস।

লজ্জায় পীতাম্বর মরিয়া গেল। তাহার অন্য দোষ যাহাই থাকুক্, পিতামাতাকে সে প্রাণ ভরিয়া ভক্তি করিত। তবে যে সে মধ্যে মধ্যে অপ্রকাশ্যভাবে পিতামাতার একটু আধ্‌টু অবাধ্য হয়, সেটা কেবল সত্যেন্দ্রের উপর রাগ করিয়া।

পীতাম্বর হাতমুখ না ধুইয়াই মাতার নিকট উপস্থিত হইল এবং

কোনও কথা না কহিয়া মাতার ক্রোড়ে শুইয়া পড়িল। জননীর নিকট পীতাম্বর এখনও বৃদ্ধ-শিশু।

বৃদ্ধ-শিশুর মনোভাব বুঝিতে পারিয়া অভয়াসুন্দরী, তাহার মস্তকে হস্ত বুলাইতে বুলাইতে কহিলেন—

"কি কর্ব বাবা, উনি না খেলে ত আমরা কেউ খেতে পারি না।"

পীতাম্বর, জননীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—

"এমন কাণ্ডই বা হয় কেন মা? আর তা'ই যদি হ'ল, তা'হলে আমার কাছে একবার খবরটা পাঠা'লে না কেন?"

আশ্চর্য্য—দেশের লোক সকলেই শুনিয়াছিল, যে সেদিন "বড়্দা" উপবাসী আছেন, কিন্তু সে কথা পীতাম্বরের কাণে যে কেন পৌছায় নাই, সে কথা বুঝিতে পারা যায় না। অনেকে বলে, পীতাম্বর সে কথাটা শুনিয়াও শুনে নাই। কাহারও কাহারও মত—তাহা নহে; আড়ত্দারির ঝঞ্ঝাটে, টাকার ঝন্ঝনানিতে সে কথাটা কাণে তুলিতে পীতাম্বর অবকাশ পায় নাই। শেষের মতটাই বোধ হয় খুব ঠিক্। টাকার শব্দ কাণে আসিলে পীতাম্বর সংসারের সকলকে ভুলিয়া যায়।

পিতাকে আহার করাইতে না পারিলে, মাতাকে আহার করান অসম্ভব ভাবিয়া লজ্জিত পীতাম্বর, নীলাম্বরের হস্তধারণ করিয়া পিতৃ-দেবের সম্মুখে উপস্থিত হইল। পীতাম্বরের মুখ হইতে আর কোনও কথা নিঃসৃত হইল না—অপরাধীর মত সে চুপ্ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। নীলাম্বর পিতার শিক্ষামত পিতামহের মুখের উপর পড়িয়া কহিল—

"দাদু-বদাই, খা'বে এছ। তুমি না খেলে আম্লা খেতে পাচ্ছি না। আমাদেল্ ক্ষিদে পেয়েছে—বদ্দ।"

"দাদু-বদাই" আর থাকিতে পারিলেন না। পীতাম্বরকে দুই একটা

শক্ত কথা বলিবার জন্যই তিনি এতক্ষণ অনাহারে ছিলেন। কিন্তু নীলাম্বর তাহার পিতার সঙ্গে আসিয়াই সব গোল করিয়া দিল।

সমস্তদিনের অনাহারের পর চিন্তামণি সত্যেন্দ্রকে লইয়া আহারে বসিলেন। তাহার পর অন্যান্য সকলের আহার হইল।

আহারান্তে সত্যেন্দ্রকে নির্জ্জনে লইয়া যাইয়া চিন্তামণি অনেক কথাই তাহাকে বুঝাইয়া বলিলেন। সকল কথা সত্যেন্দ্র বুঝিয়া উঠিতে পারিয়াছিল কি না, তাহা বলিতে পারা যায় না; তবে সত্যেন্দ্রের জীবনের গতি সেইদিন হইতে ভিন্ন দিকে ফিরিল। তাহাতে সত্যেন্দ্রের মঙ্গল হইল কি অমঙ্গল হইল, তাহা পরে জানা যাইবে।

দশম পরিচ্ছেদ।

আহারাদির পর শয়নাগারে প্রবেশ করিয়া পীতাম্বর দেখিল—তাহার পত্নী তরুলতা একজোড়া কার্পেটের জুতা, একখানা রেশমী রুমাল, একটা জরির টুপী ও অন্যান্য কয়েকটা ছোট জিনিস মেঝ্যার উপর ছড়াইয়া প্রদীপের আলোর দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া সূচের মুখে দড়ি পরাইবার চেষ্টা করিতেছে আর মধ্যে মধ্যে প্রদীপের আলোটা উজ্জ্বল করিয়া দিতেছে। সূচের সুতা সে আর কিছুতেই পরাইতে পারিতেছে না। বিরক্ত হইয়া তরুলতা কহিল—

"আঃ গেল যা—চ'খের মাথা খেনুম্ নাকি ?"

পীতাম্বর রহস্যচ্ছলে বলিল—

"কতকটা বটে !"

পীতাম্বর যে নিঃশব্দে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, তরুলতা তাহা পূর্ব্বে জানিতে পারে নাই। সহসা স্বামীকে দেখিয়া এবং স্বামীর ব্যঙ্গোক্তি শুনিয়া সে লজ্জিতা হইল। মাথার কাপড় অল্প টানিয়া তরুলতা কহিল—

"অমনই নিঃশব্দে আস্‌তে হয় বুঝি ?"

মৃদু হাসিয়া পীতাম্বর উত্তর করিল—

"আমিত আর তোমার স্বামী ভিন্ন আর কিছু নই—নিঃশব্দে না হয় এলুমই বা !"

"না, সেটা ভাল নয়—কখন্ গা, মাথার কাপড় খোলা থাকে, স্ত্রীলোকের তা'তে সম্ভ্রম নষ্ট হয়।"

সে কথায় পীতাম্বর একটু বেশী হাসিয়া ফেলিল।

তরুলতা জিজ্ঞাসা করিল—

"হাস্‌লে যে?"

"তোমার কথা শুনে—তুমি পণ্ডিতমশাই কি না!"

"কেন এমনই কি বলেছি—যা'তুমি হেসেই উড়িয়ে দিলে?"

"আমি তোমার স্বামী—গুরু লোক। আমার সঙ্গে আপনি ম'শয় ক'রে কথা কও—না হ'লে আমারও সম্ভ্রম নষ্ট হয়।"

ঈষৎ হাসিয়া তরুলতা কহিল—"আমারই কথা ফিরিয়ে ব'লে আমাকে ঠাট্টা কর্‌ছ? তা বেশ; কিন্তু দেখ, স্ত্রীলোকের লজ্জাই শোভা আর লজ্জাই ভূষণ। সে হিসেবে স্বামীর কাছেও স্ত্রীলোকের লজ্জাশীলা হওয়া উচিত।"

পীতাম্বর একটু গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়া বলিল—

"তুমি দেখ্‌ছি, সেকেলে মেয়েগুলোকেও হার মানা'তে বসেছ। কিন্তু তা'ই বা বলি কি ক'রে! কার্পেট, পশম বোনাটি আছে, ছুঁচের কায তোলাটীও আছে, লুকিয়ে লুকিয়ে বই পড়াটীও আছে, আবার ফিট্‌ফাট্ সাজাটীও আছে। অতএব কেমন ক'রে বলা যায় যে তুমি সেকেলে! এ দেখ্‌ছি সেকেলে আর এ কেলেতে মেশামেশি—কেমন নয় গা?"

তরুলতা রাজহংসীর মত গ্রীবা উন্নত করিয়া দৃঢ়তার সহিত কহিল—

"তা বল্‌তে পারি না। তবে এটা বল্‌তে পারি যে কার্পেট বুনি, ছুঁচের কায করি, সংসারের সাশ্রয় কর্‌বার জন্যে; কায কর্ম্ম সেরে, দু পাঁচ খানা ভাল বই পড়ি, দুটো ভাল কথা শেখ্‌বার জন্যে; আর ফিট্‌ফাট্ সাজি, তোমার মনস্তুষ্টির জন্যে! এ সব কর্‌লেই যে নির্ল্লজ্জার মত ব্যবহার কর্‌তে হ'বে, গায়ে মাথায় কাপড় দিতে হ'বে না, শশুর শাশুড়ী ও আর আর গুরুজনদের মান্‌তে হ'বে না, তাঁ'দের সেবা কর্‌তে হবে

না, কনিষ্ঠদের ভালবাস্‌তে হ'বে না, দাসদাসীদের মিষ্ট কথা বল্‌তে হ'বে না, সংসারের কাযকর্ম্ম কর্‌তে হ'বে না, এমন শিক্ষা ত আমি পাই নে!"

"স্যাক্‌রার ঠুক্‌ঠাক্‌, কামারের এক ঘা।" "এক ঘা" খাইয়া পীতাম্বর দুরস্ত হইল। সে তাড়াতাড়ি বলিল—

"আমি সে কথা বলি নে—সে কথা বলি নে। আমি বল্‌ছিলুম্‌ কি—যা'ক্‌ সে কথা। এখন জিগ্‌গেস্‌ করি—জিনিস পত্র মেঝের উপর ছড়িয়ে ছুঁচে দড়ি পরান হচ্ছে কেন? নীলু দুষ্টুমী ক'রে জিনিসগুলো এমন ক'রে সব ছড়িয়ে গেছে বুঝি?"

"না, নীলু মা'র কাছে যেমন ঘুমোয়, তেম্‌নি ঘুমুচ্ছে। জিনিসগুলো আমিই ছড়িয়ে রেখেছি। ও গুলোর ওপর একটা ক'রে নাম লিখে সতুকে উপহার দিতে হ'বে। ও আজ ভারী বকুনী খেয়েছে, ভারী লাঞ্ছিত হয়েছে—ওকে আজ কিছু দিতে হ'বে।"

সত্যেন্দ্রকে উপহার দিবার ঘটা দেখিয়া পীতাম্বর জ্বলিয়া গেল। সে কহিল—

"লাঞ্ছিত হয়েছে, ভালই হয়েছে। প্রহারেন ধনঞ্জয় হ'লে আরও ভাল হ'ত। যা'ক্‌, তা'র জন্য আর তোমাকে অত আদর কর্‌তে হ'বে না। তোমাদের ঐ আদর সোহাগ পেয়েই ছোঁড়া আরও মাথায় উঠেছে।"

তরুলতা বুঝিতে পারিল না যে তাহার স্বামী সত্যেন্দ্রকে এতটা অপ্রীতির চক্ষে দেখিতেছেন কেন? বিস্মিতনেত্রে স্বামীর মুখপানে সে চাহিয়া রহিল। পীতাম্বর বলিতে লাগিল—

"তুমি ওকে জান না তরু! ঐ ছোঁড়া হ'তেই আমাদের সংসারের সর্ব্বনাশ হ'বে। সে কথা এখন তোমরা কেউই বুঝ্‌তে পার না—পরে বুঝ্‌বে। হ্যাঁ গা, পর কি কখনও আপন হয়?"

তরুলতা ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করিল—

"কি, হয়েছে কি ?"

"হয়েছে আমার মাথা আর মুণ্ডু। 'তোমায় আমি ব'লে রাখ্‌ছি তরু, তুমি আর ওকে কোনো রকমে আদর দেবে না, কোনো জিনিসপত্র দেবে না—এমন কি ভাল ক'রে কথাও ক'বে না।"

"কি হ'ল কি ?"

"সে কথা শোন্‌বার তোমার অধিকার নেই। তোমার স্বামী আমি —আমার আদেশ যা', তা' তোমার মান্‌তেই হ'বে। কি বল ?"

ছড়ান জিনিসগুলি গুছাইতে গুছাইতে তরুলতা কহিল—

"তোমার আদেশ আমার পক্ষে বেদবাক্য। তা' আমার মান্‌তেই হ'বে। যখন বল্‌লে না, কি হয়েছে, তখন আর শুন্‌ব কেমন ক'রে ? কিন্তু মা যখন জিজ্ঞাসা করবেন কি হয়েছে, তখন কি ব'লব ?"

"তোমাকে কিছু ব'ল্‌তে হ'বে না—সে সব আমি ঠিক্ ক'রে ব'লব এখন !"

"হ্যাঁ গা, কথা কি একটুও ক'ব না ?"

"সামান্য এক আধটা কথা কইতে পার—অর্থাৎ যে কথা না কইলে নয়, সেই কথা কইবে মাত্র, তা' ছাড়া আর একটীও না—বুঝ্‌লে ?"

তরুলতা কি বুঝিল, তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারিল না। সে বলিল—

"তোমার কথা বেদবাক্য—ওর আর বোঝাবুঝি কি ?"

পতি, পত্নীকে স্নেহালিঙ্গনে চুম্বন করিল। কিন্তু সে রাত্রের সে আদর তরুলতার খুব যে ভাল লাগিয়াছিল, এ কথা তরুলতা কিছুতেই শপথ করিয়া বলিতে পারে না। পতির আদেশ বেদবাক্য বলিয়া সে মনে করিলেও সতুর জন্য তরুলতার প্রাণ কাঁদিতে লাগিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

সত্যেন্দ্র যখন বুঝিল, তাহাকে আর পাঠশালায় যাইতে হইবে না, তখন সে তাহার সমস্ত অপমান, সমস্ত দুঃখ কষ্ট একেবারে ভুলিয়া যাইবার অবসর পাইল। পাঠশালায় শাসনের গণ্ডীর মধ্যে থাকিতে হয়। সেখানে যাইলে নীহারিকার সহিত সুদীর্ঘকাল খেলা করিবার অবসর পাওয়া যায় না। সেই কারণে পাঠাশালার নামে সে জ্বলিয়া যাইত। সেরূপ ভীষণস্থানে তাহাকে যাহাতে না যাইতে হয় সে বিষয়ে সত্যেন্দ্র যথেষ্ট চেষ্টা করিত। এরূপ অবস্থায় যখন সে শুনিল, পাঠশালার সহিত তাহার সকল সম্পর্ক উঠিয়া গিয়াছে, তখন আনন্দে তাহার হৃদয় ভরিয়া গেল। আনন্দের সে সংবাদটা নীহারিকাকে জানাইবার জন্য সত্যেন্দ্রের প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু "বড়্দা" সে সময়ে বাটীতে ছিলেন বলিয়া ভয়ে সে আর বাটীর বাহির হইতে সাহস করে নাই। সত্যেন্দ্র স্থির করিয়া রাখিল—বড়্দা' বাঁধা বটুলতলায় যাইলে সংবাদদানের কার্য্যটা সে সম্পন্ন করিয়া আসিবে। তাহা সে করিয়াও ছিল।

পাঠশালা ছাড়িলে, খেলার যেরূপ সুবিধা হইবে বলিয়া সে মনে করিয়াছিল, সেরূপ সুবিধা কিন্তু তাহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিল না। নীহারিকার সহিত খেলা করিবার জন্য সে কিছুক্ষণের জন্য ছুটী পাইত বটে, কিন্তু পাঠশালায় পড়াশুনা করা অপেক্ষা তাহাকে অনেক বেশী পড়াশুনা করিতে হইত। এখন হইতে তাহাকে পড়াইবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন—স্বয়ং চিন্তামণি। সেখানে ফাঁকি চালাইবার সত্যেন্দ্রের

আর কোনও উপায় নাই। এক বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া সে আর এক নূতন বিপদে পড়িল। তবে পড়াশুনাটা তাহার ভালই হইতে লাগিল—বিশেষ জমীদারী-মহাজনী-শিক্ষা।

পড়াশুনা অভ্যাস করিতে করিতেই পড়শুনায় আনন্দ লাভ করা প্রায় সকলের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। সে আনন্দ সত্যেন্দ্রও যে লাভ না করিল, এমন নহে। তবে নীহারিকার সহিত মাঠে মাঠে, বাগানে বাগানে, নদীর কিনারায় কিনারায় ঘুরিয়া বেড়াইতে পারিলে, গাছে উঠিয়া ফল পাড়িতে পাইলে, পল্বলাদিতে পড়িয়া মাছ ধরিতে পারিলে, তাহার যেরূপ আনন্দ হইত, পাঠাভ্যাসে তেমন নিরাবিল আনন্দলাভ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব। সকল বালক, সকল যুবক, এমন কি সকল বৃদ্ধেরও সেরূপ আনন্দ লাভ করা ঘটিয়া উঠে না। সে আনন্দ লাভ করিতে হইলে, সাধনা করিতে হয়, যোগী হইতে হয়—তবে সিদ্ধিলাভ ঘটে, তবে সে আনন্দ উপভোগ করিবার অধিকারী হইতে পারা যায়। ফাঁকি দিয়া বিদ্যালাভ হয় না। বিদ্যা একটা যোগ। ইচ্ছা করিলে ইহাকে বিদ্যাযোগও বলা যাইতে পারে।

চিন্তামণি সে কথা বুঝিতেন। ইচ্ছা থাকিলেও সকলে যে সে পথে যাইতে পারে না, যোগী যে সকলে হইতে পারে না, সে কথাও তিনি বিশ্বাস করিতেন। সেই কারণে তাঁহার চেষ্টা ছিল, তাঁহার সত্য ছাত্রটীকে শাসন-ভারে প্রপীড়িত না করিয়া, তাহাকে বুঝাইয়া পড়াইয়া, তাহার সহিত মিষ্ট ব্যবহার করিয়া, সদালাপ করিয়া যাহাতে তাহাকে বিদ্যাসাধনা-পথের পথিক করিতে পারেন। তাঁহার সে চেষ্টার কতকটা ফলও ফলিয়াছিল। তবে সম্পূর্ণ ফল ফলে নাই। সেটা সত্যেন্দ্রের অদৃষ্ট—প্রাক্তন। যাঁহারা জড়বাদী—অদৃষ্টবাদে যাঁহাদের বিশ্বাস নাই, তাঁহারা অবশ্য এ সকল কথায় আস্থাবান হইতে পারিবেন না।

সে যাহা হউক, সত্যেন্দ্রের শিক্ষাও চলিতে লাগিল আর সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রকৃতিরও পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। বয়োবৃদ্ধি, শিক্ষা-মাহাত্ম্য অথবা সঙ্গগুণ—কোন্‌টা সে পরিবর্ত্তনের মূল কারণ—তাহা লইয়া গ্রামের অনেকস্থানেই আন্দোলন, আলোচনা চলিতে লাগিল। কোনও অভিজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়াছিলেন—তিনটা জিনিসের সমন্বয়েই সত্যেন্দ্রের প্রকৃতিতে এমন অভাবনীয় পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সেই কথাটাই পাকা কথা। এই সমন্বয়ের গুণে "কু"—"সু" হয়; আবার তাহার দোষে "সু"ও "কু" হয়। সুকুমারমতি বালকগণ সে কথা না বুঝিলেও, তাহাদের অভিভাবকগণের তাহা বিলক্ষণ বুঝা উচিত! সে কথা এখন অনেকে বুঝিতে চাহে না বলিয়াই ত আমাদের সমাজে শিক্ষার প্রভাব আর তেমন বৃদ্ধি পাইতেছে না, শিক্ষা-বিস্তার সেরূপভাবে আর হইতেছে না—শিক্ষা-সঙ্কট ক্রমেই বাড়িতেছে, আর ভবিষ্যৎ বংশধরগণের সর্ব্বনাশের পথ প্রশস্ত হইতেছে।

তথাপি আমাদের ধারণা—আমাদের সন্তান সন্ততিগণকে আমরা মানুষ তৈয়ারী করিতেছি—ছ্যা!

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

সত্যেন্দ্র ক্রমেই বুঝিতে লাগিল যে তাহার দাদাভাই—পীতাম্বর তাহার উপর আদৌ সন্তুষ্ট নহে। সত্যেন্দ্র সে বাটীতে না থাকে, এরূপ ইচ্ছাও যে পীতাম্বর হৃদয়ে পোষণ করিতেছে, সে কথা বুঝিতেও সত্যেন্দ্রের বাকী রহিল না। মানুষের মন নারায়ণ—মানুষের বুঝিতে আবার বাকী থাকে কি? লোকের ব্যবহার দেখিয়া যাহারা লোকের মনের কথা না বুঝিতে পারে, তাহারা নিরতিশয় দুর্ভাগ্য। সত্যেন্দ্রকে সে শ্রেণী ভুক্ত করা চলে না। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অনেক জিনিসই সে এখন বুঝিতে শিখিয়াছে।

"দাদাভাই" চ'খ রাঙ্গাইয়া যে "বৌদিদিকেও" সত্যেন্দ্রের সহিত অধিক কথা কহিতে মানা করিয়া দিয়াছে, সে কথাও সত্যেন্দ্র ক্রমে ক্রমে বুঝিতে পারিল। নীলুও পিতার শাসনে সত্যেন্দ্রের নিকট আর বড় বেশী আসিতে চাহে না। তবে মধ্যে মধ্যে সে শাসনও যে নীলু অবহেলা না করে, এমন নহে। সেই সময়ে তাহার পিতার সকল শাসনের কথা, নীলু, সত্যেন্দ্রের নিকট অকপট হৃদয়ে প্রকাশ করিয়া ফেলে। ছেলে মানুষ নীলু—কথা চাপিতে শিখিবার এখনও বয়স হয় নাই। সুতরাং গুপ্তকথা প্রকাশ করিয়া ফেলায় তাহার অপরাধই বা কি? যে সকল পিতা পীতাম্বরের পথানুগামী, তাঁহারাও নীলুর অনাবধানতা দেখিয়া সাবধান হউন। শিশুকে মিথ্যাশাসন করিতে নাই, মিথ্যাকথা শিখাইতে নাই। তাহাতে শিশুরও সর্ব্বনাশ আর শিশুর জনকজননী অভিভাবকাদিরও সর্ব্বনাশ। স্বেচ্ছায় কি এমন সর্ব্বনাশকে ডাকিয়া আনিতে আছে?

এই ব্যাপারে বিশেষ বিপদগ্রস্ত হইলেন—চিন্তামণি ও অভয়াসুন্দরী। পীতাম্বরের মনের ইচ্ছাটা যে কি, তাহা তাঁহাদের নিকট খুব অজ্ঞাত ছিল না। সে কথা চিন্তামণি বুঝিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই চিন্তামণি চিন্তান্বিত হইয়া পড়িলেন। চিন্তামণির চিন্তা যখন বাড়িল, তখন অভয়াসুন্দরীও আর চিন্তা না করিয়া করেন কি? সেই কারণেই ত বলিতেছিলাম—বিশেষ বিপন্ন হইলেন চিন্তামণি এবং তাঁহার পত্নী অভয়া-সুন্দরী। তাঁহারা ভাবিতে লাগিলেন—পীতাম্বরের একি উপদ্রব—আর এ উপদ্রব কেমন করিয়াই বা নিবারণ করা যায়!

অভয়াসুন্দরীর মনের ইচ্ছা—পূর্ব্বে যেমনটী ছিল, আবার তেমনটী হয়। কিন্তু সেটা কি সহজসাধ্য না সহজলভ্য? যাহা যায়, তাহা আর হয় না; মাথা খুঁড়িলে, বুক চাপ্‌ড়াইলেও অতীত আর ফিরিয়া আসে না। ঐ জিনিসটার ধারাই ঐরূপ। তবে ভাগ্য প্রতিকূলাচরণ করিয়াও যে অনুকূল ব্যবহার করে না, "কুদিনে" পড়িয়া মানুষ আর যে কখনও "সুদিনের" মুখ দেখিতে পায় না, এমন কোনও কথা নাই। কিন্তু সে ভাগ্য কয় জনের?

চিন্তামণি, ইচ্ছা করিলে পীতাম্বরকে যে একটু শাসনও না করিতে পারিতেন, তাহা নহে। কিন্তু সে পথে চলিতে এখন তিনি রাজী হইলেন না। তাহার কারণ—প্রবল অভিমান। চিন্তামণির মনের কথা—পীতাম্বর তাঁহার পুত্র হইয়া যখন এমন হীন হইতে পারে, তখন তাহাকে আর কিছু না বলাই শ্রেয়ঃ। যে পিতৃমর্য্যাদা, বংশমর্য্যাদা, আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারে না, করিতে জানে না বা ইচ্ছা করে না, সে শাসনের অতীত। অন্ততঃ চিন্তামণির এমনই ধারণা।

চিন্তামণি অভিমানভরে আর একটা কায করিয়া ফেলিলেন। ইতঃপূর্ব্বে চিন্তামণির সঙ্কল্প ছিল, সত্যেন্দ্র আর একটু বড় হইলে, তিনি

তাহাকে তাহার পৈত্রিক বাসভবনে প্রতিষ্ঠিত করিবেন। অভিমানের প্রাবল্যে সে কার্য্যটা এই সময়ের মধ্যেই হইয়া গেল। অনুনয়, অনুরোধ করিয়াও অভয়াসুন্দরী, সে কার্য্যে স্বামীকে বাধা প্রদান করিতে পারিলেন না।

কাঁদিতে কাঁদিতে সত্যেন্দ্র তাহার পৈত্রিক "ভদ্রাসনে" চলিয়া গেল। বাটীর রক্ষক এবং সত্যেন্দ্রের একপ্রকার অভিভাবক হইল—জনাবালি মিঞা। সে ভার জনাবালি কিছুতেই গ্রহণ করিতে চাহে নাই। কিন্তু "বড়্দা" যখন তাহাকে সে ভার গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন, তখন জনাবালি সে অনুরোধ আর কিছুতেই উপেক্ষা করিতে পারিল না। জনাবালির স্ত্রী পুত্র কিছুই ছিল না—সে সকল জিনিসগুলি পাইয়াও সে অসময়ে হারাইয়া ফেলিয়াছিল। সুতরাং তাহার নিজের ঘরবাড়ী ছাড়িয়া সত্যেন্দ্রের নিকট থাকায় জনাবালির কোনও অসুবিধাই হইল না।

জনাবালি পূর্ব্বে যে সত্যেন্দ্রের বাটীতে থাকিতে চাহে নাই, তাহার অন্য একটা কারণ ছিল। জাতিতে সে মুসলমান। সত্যেন্দ্রের বাটীতে সে থাকিলে পাছে তাহার হিন্দু-ভ্রাতারা সত্যেন্দ্রের বিরুদ্ধাচরণ করে, দলাদলির ঘোঁট করে, সেই ভয়টাই জনাবালির সমধিক হইয়াছিল। কিন্তু চিন্তামণি যখন তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন—সতুর বাটীতে সে ত আর পাচকের কর্ম্ম করিতে যাইতেছে না, কিম্বা ঠাকুর পূজার কার্য্যেও নিযুক্ত হইতেছে না যে তাহা লইয়া একটা দলাদলি বাধিবে, একটা ঘোঁট হইবে,—তখন জনাবালি সেখানে থাকিতে রাজী হইল। চিন্তামণি তাহাকে আরও বুঝাইয়া দিলেন—ভালবাসার জগন্নাথ-ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ শূদ্রের বিচার নাই, হিন্দু মুসলমানের ভেদজ্ঞান নাই। সমাজ রক্ষা কল্পে সে সকল বিচার, বিবেচনা, ভেদাভেদ আছে—আর থাকিবেও। কিন্তু

ভালবাসার মহাদ্রুম যেখানে শিকড় গাড়িয়া বসিয়াছে, সেখানে ও বিচার চলেও না—আর থাকেও না।

চিন্তামণির বিচার, বিবেচনা ও চেষ্টার ফলে বিপিনকৃষ্ণের সমস্ত ঋণ শোধ হইয়া গিয়াছিল। এখন সত্যেন্দ্র আপনার বাটীতে আপনি কর্ত্তা হইতে "বড়্দার" যে কি একটা অব্যক্ত আনন্দানুভব হইল, তাহা বড়্দা' ব্যতীত আর কেহই বুঝিতে পারিল না। সে আনন্দের ভাগ অভয়াসুন্দরী অবশ্য কিছু পাইয়াছিল—কারণ অভয়া যে চিন্তামণির জীবন-সঙ্গিনী—সহধর্ম্মিণী।

সত্যেন্দ্র আপনার বাটীতে আসিয়া আপনি কর্ত্তা হওয়ায় অবশ্য খুব আনন্দলাভ করিল—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে নিরানন্দও হইতে হইল। নিরানন্দের কারণ—"বড়্দার" স্নেহ-নীড় হইতে বঞ্চিত হওয়া। কিন্তু তাহার "দাদাভায়ের" অত্যাচার যখনই তাহার মনে পড়িতে লাগিল, তখনই সে একটা আরামের দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিতে লাগিল— "বড়্দা'' যাহা করিয়াছেন, তাহাতে কি আর এতটুকু অবিচার থাকিতে পারে?

আপন ভবনে আসিয়া সত্যেন্দ্রের কিন্তু এক বিষয়ে অত্যন্ত অসুবিধা হইতে লাগিল। পাচকব্রাহ্মণ, দাসদাসী প্রভৃতি সে বাড়ীতে অনেকগুলি থাকিতেও সত্যেন্দ্রের সব যেন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকিতে লাগিল। জনাবালি বাহিরের ঘরে বসিয়া সত্যেন্দ্রের সহিত অনেক গল্প-গুজব করে, অনেক মিষ্টকথা বলে; কিন্তু তাহাতেও তাহার সে "ফাঁকা ফাঁকা ভাবটা" কিছুতেই ঘুচিল না।

চিন্তামণিকে সুতরাং কিছুদিনের জন্য সত্যেন্দ্রের নিকটে আসিয়া থাকিতে হইল। পিতৃ-মাতৃহীন নিঃসম্বল বালককে তিনি না দেখিলে আর দেখিবে কে?

অভয়াসুন্দরীকেও এখন দিনের মধ্যে তিন চারিবার করিয়া সত্যেন্দ্রের বাটীতে আসিতে হয়। তিনি না আসিলে সত্যেন্দ্র প্রভৃতিরই বা আহারাদির বন্দোবস্ত করিয়া দেয় কে—আর "কর্ত্তা" অহিফেন-ভ্রমে তামাকের "কাট্" খাইতেছেন কিনা তাহার তত্ত্বাবধানই বা কে করে?

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

"বড় দা'র" বাড়ী ছাড়িয়া সত্যেন্দ্র যেদিন আপনার বাড়ীতে চলিয়া যায়, তরুলতা সেদিন খুবই কাঁদিয়াছিল। সে চ'খের জল তাহার স্বামীর ভৎসনাতেও বন্ধ হয় নাই। অশেষরূপে তিরস্কৃতা হইয়া তরুলতা সেদিন অনশনে, অনিদ্রায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া রাত্রিবাপন করিয়াছিল। সে কথা কিন্তু তাহার শ্বশুর কিম্বা শাশুড়ী কেহই জানিতে পারেন নাই।

তরুলতার প্রকৃতিই ঐরূপ। তাহার মনের কথা—তাহার স্বামী কিম্বা অন্যান্য গুরুজনাদির দোষ ত্রুটীর কথা সে কাহাকেও বড় একটা জানিতে দেয় না। প্রাণের ব্যথা সে প্রাণে চাপিয়া রাখিতে পারে; হৃদয়ের ব্যাকুলতা সে হৃদয়ে মিশাইয়া দিতে পারে; পারে না কেবল সে পরের আনন্দে নিরানন্দ হইতে—পারে না কেবল স্ত্রীবুদ্ধিবশে প্রলয়ঙ্করী হইতে—জানে না কেবল সে হিংসা, দ্বেষ, পরনিন্দা, পরশ্রীকাতরতা।

পীতাম্বর যে সে কথা না বুঝিত, তাহা নহে। কিন্তু সে বুঝিয়াই বা কি করিতে পারে? স্বার্থ-চিন্তায় যে মনুষ্যত্ব হারাইয়াছে, অপরের মহত্ত্ব উপলব্ধি করিবার তাহার কি আর স্পৃহা থাকে, না অবসর ঘটে? মহত্ত্ব বুঝিবার শক্তি থাকিলে সে ত তাহার পিতার আদর্শ দেখিয়াই মনে মনে লজ্জিত হইত, আর কুপথ ত্যাগ করিয়া সুপথে আসিবার অন্ততঃ চেষ্টাও করিত। কিন্তু স্বার্থের পঙ্কিল-পথে যে একবার পা বাড়াইয়াছে, সেরূপ করা তাহার পক্ষে কি আর সম্ভবপর? সেই কারণেই ত জীবন-প্রভাত হইতেই মহাজনের পদানুসরণ করিয়া চরিত্রগঠন করিবার শিক্ষা মহাজনগণই দিয়া দিয়াছেন। সে শিক্ষায় শিক্ষিত

হইলে মানুষকে জীবন-মধ্যাহ্নে আর দুঃখ কষ্ট ভোগ করিতে হয় না এবং জীবন-সন্ধ্যাতেও আর অনুতাপের তপ্ত অশ্রুজল ফেলিতে হয় না। মানুষ বুঝে না বলিয়াই না মানুষের এমন দুর্দ্দশা!

নিতান্ত স্বার্থপর হইলেও পীতাম্বরের অবশ্য নিজের দোষগুণ বুঝিবার বুদ্ধি ছিল। সে বুঝিতে পারিল—যে ভুলের বীজ সে বহুপূর্ব্বে রোপণ করিয়াছিল, আজ তাহার অঙ্কুর উদ্গম হইল। সে অঙ্কুর দেখিয়া পীতাম্বরের প্রতীতি জন্মিল, তাহা মহাদ্রুমে পরিণত হইলে, তাহার জীবন-কানন সূর্য্যালোক হইতে বঞ্চিত হইবে। সে আলোক না পাইলে কানন-কুসুম ফুটিবে কেমন করিয়া, কানন-শোভা থাকিবে কেমন করিয়া? সূর্য্যালোক—পীতাম্বরের পিতৃ-স্নেহ; ভুলের অঙ্কুর—তাহার স্বার্থজনিত মহাপাপ। পীতাম্বরের একবার ইচ্ছা হইয়াছিল, সে অঙ্কুর সে আপনিই উৎপাটিত করিয়া ফেলে। কিন্তু সে কার্য্য করিতে তাহার শক্তিতে কুলাইল না—লোভ আসিয়া, অহঙ্কার আসিয়া তাহাকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলিল। আর একটা কথা—যে দোষী, সে শক্তিহীন। শক্তিহীন আবার শক্তির কার্য্য করিবে কেমন করিয়া?

কলুষ-কল্মষশূন্যা, পবিত্রহৃদয়া, শক্তিমতী তরুলতার নিকট সেই কারণে পীতাম্বর শক্তিভিক্ষা করিল। পীতাম্বর তরুলতাকে কহিল—

"তরু, কি বিপদে পড়েছি, তা' কি বুঝ্‌তে পার'ছ?"

পীতাম্বরের আহ্বানে অসময়ে তরুলতাকে শয়ন-গৃহে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল বলিয়া তরু বিশেষ লজ্জিতা হইয়া পড়িয়াছিল। সেইকারণে সে প্রথমে কথা কহিতে পারেও নাই আর কথা কহিতে চায়ও নাই। কিন্তু যখন সে বারবার শুনিল যে তাহার স্বামীর বিপদ, তখন কি আর সে স্থির থাকিতে পারে? তরুলতা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল—

"কি হয়েছে—কিসের বিপদ?"

"তুমি কি গো, চ'খে দে'খছ, তবু কিছু বুঝ্‌তে পার না ?"

পীতাম্বরের ইঙ্গীতের কথা তরুলতা কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বিস্ময়াবিষ্টার মত স্থির দৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া রহিল। সে মনে মনে বিচার করিতে লাগিল—স্বামীর কথামত কোন্‌ জিনিস্‌টা সে চক্ষে দেখিতেছে, এবং তাহা দেখিয়াও কোন্‌ জিনিসটা সে বুঝিতে পারিতেছে না।

পীতাম্বর তাহার ইঙ্গীতের ভাষা ক্রমে সরল, সহজ, বোধগম্য ভাষায় পরিণত করিতে বাধ্য হইল। তাহা না করিলে তরুলতা কোনও কথাই বুঝিতে পারে না। পীতাম্বরের সহজ কথায় তরুলতা এখন বুঝিতে পারিল যে তাহার স্বামী বলিতেছে—সতু তাহাদের বাটী হইতে চলিয়া যাইবার পরও যখন মা ও বাবা দুইজনেই সতুর বাটীতে যাইতে-ছেন, তাহাকে স্নেহাদর করিতেছেন, তখন সেটা তাহার স্বামীর পক্ষে সমূহ বিপজ্জনক। এরূপ ব্যাপার কিছুকাল চলিলে, ভবিষ্যতে যে তাহাদের দারুণ অনিষ্ট হইবে, বিষয়-সম্পত্তি হইতেও তাহার বঞ্চিত হইবার সম্ভাবনাও যে বিলক্ষণ আছে, সে কথাও পীতাম্বর তাহাকে বুঝাইয়া দিয়াছিল। কিন্তু অত কথা তরুলতা বুঝিতে চাহিল না বা বুঝিতে পারিল না। স্বামীকে সে জিজ্ঞাসা করিল—

"তা'—আমি কি ক'রব ?"

পত্নীর প্রশ্ন শুনিয়া স্বামী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু সে ভাব প্রকাশ না করিয়া পীতাম্বর কহিল—

"বাবা যা'তে আর সেখানে না যান্‌—অন্ততঃ না থাকেন, সে অনুরোধ তাঁ'কে তোমায় কর্‌তে হ'বে। আর মা'কেও সব কথা তোমায় বুঝিয়ে বল্‌তে হ'বে। তোমার কথা তাঁ'রা খুব শোনেন। সেইজন্যেই তোমাকে দিয়ে এসব কথা আমি বলা'তে চাচ্ছি।"

"তা’ তুমি বল না কেন—আমি কি অত কথা তাঁ’দের বুঝিয়ে বল্‌তে পা’রব ?"

"পা’রবে—খুব পা’রবে—বিরক্ত কর কেন ? বুঝ্‌তে পার্‌ছ না, বাবা মা রাগ ক’রে আমাদের সংসারের দিকে না চাইলে সংসারটা নষ্ট হ’য়ে যা’বে।"

"তা’ সতুকে ফিরিয়ে আন্‌লেই ত সব গোল এক কথায় মিটে যায়। তা’ই কর না কেন ? তা’ হ’লে বাবাও ত আর সেখানে থাকেন না আর মাও সেখানে যান না !"

পীতাম্বর এইবার বিপদেও পড়িল আর বিরক্তও হইল। স্বামীকে নীরব থাকিতে দেখিয়া তরুলতা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—

"কেমন, সেই ভাল নয় ?"

শয্যার উপর শুইয়া পড়িয়া পীতাম্বর কহিল—

"না, সে সুবিধে হ’বে না। তা’তে অনেক গোল। সে যখন নিজের বাড়ীতে গেছে, তখন কি আর সে আস্‌তে চায় ?"

"তা’ আস্‌বে না কেন—তুমি যদি বল, তবে আমি গিয়েই তা’কে ধ’রে আন্‌তে পারি।"

একটা বালিস মাটির উপর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া পীতাম্বর কহিল—

"আঃ, তুমি ভারী সব গোল্‌মেলে কথা বল। যা’ হ’বার নয়, তা’কি কখনও হ’য়ে থাকে ? যাও, যাও, তুমি এখন সংসারের কাজকর্ম্ম কর গে —তা’রপর যা’ হয় হ’বে এখন।"

মুক্তি পাইয়া তরুলতা সংসারের কাজকর্ম্ম করিতে চলিয়া গেল। পীতাম্বর শয্যায় পড়িয়া অনেক কথাই ভাবিতে লাগিল। একবার সে ভাবিল—নীলুর দ্বারা সে স্বকার্য্য উদ্ধার করিবে। কিন্তু পরক্ষণেই সে

ভাবিল—সেটা তেমন সুবিধাজনক হইবে না। তখন পীতাম্বরের ভাবনার আর অবধি রহিল না।

রাত্রিকালে সংসারের সমস্ত কাজকর্ম্ম সারিয়া তরুলতা যখন শয়ন-গৃহে আসিল, তখন পীতাম্বর তাহাকে এ বিষয়ে বিশেষ অনুরোধ করিতে লাগিল। এবারে পীতাম্বর সিদ্ধকাম হইল—কারণ এবারের অনুরোধে পীতাম্বরের বেদনা, কাতরতা ও অশ্রুজল মিশ্রিত ছিল। তরুলতা কেমন করিয়া আর সে অনুরোধ উপেক্ষা করিবে ?

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

"জনাবালি চাচার" সহিত সত্যেন্দ্রের আজ একটা ভারী রকমের তর্ক-বিতর্ক হইয়া গিয়াছে।" সেই কারণে সত্যেন্দ্র ও জনাবালি উভয়েই আজ কিছু বিষণ্ণ।

তর্ক-বিতর্কের কারণ—গ্রামের একটা সখের যাত্রার দল। সে দলে সত্যেন্দ্র নাম লিখাইয়াছিল এবং মধ্যে মধ্যে সেখানে যাতায়াতও আরম্ভ করিয়াছিল। যাত্রার দলে সত্যেন্দ্র খুব প্রকাশ্যভাবে যোগদানে বিরত ছিল বলিয়া কথাটা "বড়্দার" কাণে এখনও পৌঁছায় নাই। কিন্তু "হেটো" জনাবালির চক্ষে ধূলিনিক্ষেপ করা বড় কঠিন ব্যাপার। সে শ্যেন-চক্ষু সত্যেন্দ্র এড়াইতে পারে নাই। সত্যেন্দ্রকে "পাকৃড়াও" করিয়া জনাবালি দশকথা শুনাইয়া দিল এবং ভবিষ্যতে সেরূপ করিলে "বড়্দার" নিকট যে সকল কথা সে জ্ঞাপন করিবে, এমন ভয়ও জনাবালি মিঞা দেখাইতে ছাড়িল না।

সত্যেন্দ্র নানা তর্কযুক্তির অবতারণা করিয়া জনাবালিকে বুঝাইবার চেষ্টা করিল যে "থিয়েটার" করায় কিছু দোষ থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু "যাত্রা গাওয়ায়" কোনও দোষই থাকিতে পারে না। কলিকাতার অনেক সম্ভ্রান্ত লোকই এইরূপ যাত্রা প্রভৃতির দলে যোগদান করিয়া থাকেন এবং সভ্য ব্যক্তি মাত্রেরই এইরূপ করা উচিত।

যাত্রার দলে মিশিয়া সত্যেন্দ্র নানা কথা শিখিয়া ফেলিয়াছিল। সেই সকল কথা বলিয়া জনাবালির মন ভিজাইতে এবং তাহার নিকট পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিতে সে বিধিমতে চেষ্টা করিল। কিন্তু জনাবালি অসভ্য;

সভ্যতার ধার সে কিছুই ধারে না। কাজেই সে সকল কথা সে কাণেও তুলিল না। দৃঢ়তার সহিত জনাবালি কহিল—

"হমন ধারা সৈভ্য মুই তোটাকে হতি দ্যাব না—তা'তে বাপা, তুই ঝাই কর্, আর ঝাই বল্। রাখে দ্যাও তোমার কলকাত্তা—সেহানে সব চলে। আমাগোর দ্যাশে কি তাই চল্‌তি পারে?"

এই কথায় তর্ক-বিতর্কের মাত্রা আরও বাড়িয়া গেল। কলিকাতার নিন্দাটা সত্যেন্দ্র আজকাল কিছুতেই সহ্য করিতে পারে না। কলিকাতার বাবুয়ানা, কলিকাতার চুল-ছাঁটা, কলিকাতার "গ্যাস্‌বাতি, কলিকাতার যাত্রা, থিয়েটার, কলিকাতার "অলি গলি' প্রভৃতি যে সমস্তই ভাল, মন্দ সেখানে যে আদৌ নাই, একথা পরের মুখে শুনিয়া সত্যেন্দ্র বিশ্বাস করিয়াছিল এবং তাহার ধারণাও সেইরূপ হইয়াছিল। দলে মিশিয়া, দলের কথা শুনিয়া সত্যেন্দ্র কলিকাতার পক্ষপাতী এতই হইয়া পড়িয়াছিল যে দিবারাত্রি সে চিন্তা করিত—কলিকাতা একটা স্বর্গ বিশেষ—সেখানে যাইতে পারিলে, থাকিতে পারিলে মনুষ্য-জীবন ধন্য হইয়া যায়।

সেই কলিকাতার এতটা নিন্দা অসভ্য জনাবালি যখন এরূপভাবে করিল, তখন সত্যেন্দ্র আর কিছুতেই রাগ সাম্‌লাইতে পারিল না। জনাবালি চাচাকে সে আচ্ছা করিয়া পাঁচ কথা শুনাইয়া দিল এবং কলিকাতার লোকেরা জনাবালি চাচার নিন্দাবাদ শুনিলে যে চাচার উপর বিশেষ অসন্তুষ্ট হইবে ও "লাল পাগ্‌ড়ী"র হাতে ধরাইয়া দিবে এমন ভয়ও সত্যেন্দ্র দেখাইয়া দিল। কিন্তু তাহার সে ভয় প্রদর্শনে কোনও কাযই হইল না। জনাবালি, সত্যেন্দ্রকে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া দিল—ভবিষ্যতে যাত্রা-ঘরের সীমানায় পা বাড়াইলেই সকল কথা সে "বড়্‌দা"কে বলিতে বাধ্য হইবে।

রাগারাগি করিয়া দুইজনেই মনক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িল। তাহা ত হইবারই কথা। যেখানে ভালবাসা, সেইখানেই তর্ক-বিবাদের পর দারুণ অনুতাপ।

চিন্তামণি, সত্যেন্দ্র ও জনাবালির ক্ষুণ্ণভাব লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"তোদের আজ কি হয়েছে রে?—দুজনেরই মন ভার ভার দেখ্‌ছি যে?"

"বড়্‌দার" তামাকু সাজিতে সাজিতে জনাবালি কহিল—

"হ'বে আবার কি গো বর্‌দা, ছাতুবাবু এট্টু অল্যায় কর্‌ছিল, তেইতে দুটা বকুন্ দেছি। আর তেইতে বাপার আগ্ হইছে। হৈ বর্‌দা, বুঝ্ করত, ওয়ার অল্যায় কি মুই সহ্যি কর্‌তি পারি?"

চিন্তামণি হাসিয়া বলিলেন—

"তা'ত নয়ই। কিন্তু কি রকমটা ও করেছিল, তা' বল্ দেখি জনাব। তা'হলে আমি ওকে শাসন কর্‌তে পারি।"

শাসনের কথা শুনিয়া সত্যেন্দ্রেরও মুখ শুকাইল আর জনাবালিরও মুখ শুকাইল। সে শাসনের কথায় তাহাদের আর একদিনের শাসনের কথা মনে পড়িল। সেদিন "বড়্‌দার" সংসারে কাহারও মুখে অন্নজল পড়ে নাই।

সেই দিন স্মরণ করিয়া জনাবালি, সত্যেন্দ্রের সহিত "আপোষ" করিয়া ফেলিল। সত্যেন্দ্রও সে "আপোষে" আপত্তি করিল না। চিন্তামণি তখন হাসিতে হাসিতে তাম্রকূট সেবনে মনযোগ দিলেন। জনাবালি উঠানের "ঘাস নিড়াইতে" চলিয়া গেল।

ইতিমধ্যে নীলু আসিয়া চিন্তামণিকে সংবাদ দিল যে তাহার মাতার জ্বর হইয়াছে। চিন্তামণি, আপন বাটীতে না যাইয়া আর থাকিতে

পারিলেন না। নীলু তাহার "দাত বদাইকে" সঙ্গে লইয়া চলিয়া যাইবার পর সত্যেন্দ্র বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল—কলিকাতা ভাল, কি পল্লীগ্রাম ভাল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

তরুলতার ভারী অসুখ। পুষ্করিণীতে কাপড় কাচিতে গিয়া ঘাটে সে পড়িয়া গিয়াছিল। আঘাতটা খুব গুরুতর না হইলেও খুব সামান্য হয় নাই। সেই পতন ও আঘাতের ফলেই তাহার জ্বর আসিয়াছে।

চিন্তামণি বাড়ীতে আসিয়া চিকিৎসক ডাকাইয়া বধূমাতার চিকিৎসার ব্যবস্থা করাইলেন। কিন্তু সুচিকিৎসা সত্ত্বেও রোগের খুব "সুরাহা" হইল না। জ্বরটা ক্রমে একটু "বাঁকিয়া" দাঁড়াইল। ডাক্তার বলিলেন—

"জ্বরটা যে কেবল পতন-জনিত, সে কথা এখন আর আমি বল্‌তে পার্‌ছি না। রোগটা সান্নিপাতিক-জ্বরে দাঁড়িয়েছে।"

সেই মতই চিকিৎসা চলিতে লাগিল। অভয়াসুন্দরী ও চিন্তামণির ভাবনার আর সীমা রহিল না। তরুলতা তাঁহাদের আদরের পুত্রবধূ।

পীতাম্বরও ভয়ে ব্যাকুল হইয়া পড়িল। সে ভাবিতে লাগিল— তরুর যদি কিছু ভাল মন্দ হয়, তাহা হইলে সংসারে তাহার হইয়া দুইটা কথা বলিবার আর কেহই থাকিবে না। পীতাম্বর আপন দোষে যে পিতামাতার অপ্রিয় হইয়া পড়িয়াছে।

পীতাম্বর স্থির করিয়াছিল, তরুলতার দ্বারা অনুরোধ করাইয়া পিতামাতার পূর্ব্বভাব, পূর্ব্ব স্নেহ সে ফিরাইয়া আনিবে। তরুলতাও স্বামীর নির্ব্বন্ধাতিশয্যে সে অনুরোধ করিতে স্বীকার করিয়াছিল। কিন্তু মানুষ যাহা ভাবে, অনেক সময়ে তাহার বিপরীতটাই হইয়া দাঁড়ায়।

পীতাম্বর ভাবিয়াছিল এক—হইয়া দাঁড়াইল আর। তরুলতা রোগে পড়িতেই যত গোল বাধিল। সকলই অদৃষ্ট!

রোগিনীর রোগ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সান্নিপাতিক বিকারে তরুলতা অনেক অসংলগ্ন বাক্যই বলিতে লাগিল। কিন্তু সে প্রলাপ-বাক্যেও একটা কঠিন সত্যের অস্পষ্ট ইঙ্গীত ছিল। কে জানে, কেমন করিয়া এমন হয়!

তরুলতা, প্রলাপ-বচনে কখনও সতুকে ডাকিত, কখনও স্বামীকে ভর্ৎসনা করিত, আর কখনও কখনও বা শ্বশুরের নিকট স্বামীর হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিত। অনেক সময়েই তাহার অনেক কথার অর্থ সংগ্রহ করিতে পারা যাইত না। অনেক সময়ে আবার সকল কথারই স্পষ্ট অর্থ বুঝা যাইত।

সতুকেও আবার "বড়্দা'র" বাড়ীতে আসিতে হইল—"বৌদিদির" সেবা করিতে। পীতাম্বরের যদিও তাহা আদৌ ভাল লাগিল না, কিন্তু সতুকে বাধা প্রদান করেই বা সে কেমন করিয়া?

মনে মনে পীতাম্বর, সতুকে অবশ্য এতটুকু দেখিতে পারিত না; কিন্তু প্রকাশ্যে সে এখন হইতে সতুর প্রতি খুবই স্নেহমমতা দেখাইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া চিন্তামণি ও অভয়াসুন্দরী উভয়েই সন্তোষ লাভ করিলেন। তাঁহারা ভাবিলেন—পীতাম্বরের মতিগতি এখন অনেকটা ফিরিয়াছে; আর কিছুদিন গত হইলে তাহার মতিগতি আরও ফিরিবে।

যাঁহারা সরল, উদার, তাঁহারা অন্যের এতটুকু মিষ্ট ব্যবহার দেখিলেই গলিয়া যান। সরল প্রাণের ঐ ত দোষ—ঐ ত দুর্ব্বলতা। উদারতার ঐ দুর্ব্বলতা আছে বলিয়াই না দুষ্ট ব্যক্তি আপনাদের স্বার্থসিদ্ধি করিয়া লইবার অবসর পায়।

পুত্রের মতিগতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে দেখিয়া চিন্তামণি যেমন আনন্দ

লাভ করিয়াছিলেন, পুত্রবধূর রোগবৃদ্ধি দেখিয়া তিনি তেমনই নিরানন্দ হইলেন। ডাক্তার বলিয়া গিয়াছেন রোগ বড় কঠিন এবং রোগ চরমে উঠিয়াছে—রোগিনীর জীবনের আশা অত্যল্প।

ডাক্তারের মুখ হইতে অপ্রিয় সত্যটা বজ্রপাতের শব্দের মত শুনাইয়াছিল। তাহা শ্রবণানন্তর পীতাম্বর হুতাশে ও হতাশে প্রায় চৈতন্য হারাইল। অভয়াসুন্দরী কাঁদিয়া স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কি হ'বে তা' হ'লে—বৌমা যে আমাদের সংসারের লক্ষ্মী গো!"

চিন্তামণি বিরক্ত হইয়া কহিলেন—

"আঃ—কি কর?"

"কি ক'রব, তুমি বল না গো! আমি যে আর কিছুতে স্থির হ'য়ে থাকৃতে পারছি না!"

দৃঢ়তার সহিত চিন্তামণি কহিলেন—

"স্থির থাকৃতে হ'বে—বিপদের সময় স্থিরই থাকৃতে হয়। অস্থির হ'লে বিপদ আরও বাড়ে ভিন্ন কমে না।"

"স্থির না হয় হলুম্। কিন্তু তুমি যা' হয় একটা উপায় কর। এ ডাক্তার না হয়, কল্‌কাতা থেকে ভাল একজন ডাক্তার আন।"

"ও সবই সমান গো, সবই সমান। সে কথা যা'ক্। এখন তোমরা আমার একটা কথা শোন দেখি। সবাই এস আমার সঙ্গে।"

"কোথায়?"

"বৌমার কাছে।"

"কেন?"

"যমের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হ'বে! ইচ্ছা-মন্ত্রে, ইষ্টমন্ত্রে যমরাজকে আমি পরাস্ত ক'রব। নিয়ে এস আমার নামের মালা, আর নিয়ে এস আমার নৃসিংহ-কবচ। ভারী চ'খ রাঙ্গায় সে প্রেতপুরের রাজা, ভারী

ভয় দেখায় সে অন্ধকারের দেবতা। দেখি আজ ভক্তের ভগবান আছেন কিনা—দেখি আজ ঐকান্তিকতা যোগে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে পারি কি না! যাও, দাঁড়িয়ে শুনছ কি ?"

স্বামীর কথা শুনিয়া অভয়াসুন্দরী হৃদয়ে বল পাইয়াছিলেন। নামের মালা ও নৃসিংহ কবচ আনিয়া অভয়াসুন্দরী স্বামীর হস্তে প্রদান করিলেন। চিন্তামণি কবচখানি রোগিনীর কণ্ঠদেশে পরাইয়া দিয়া ইষ্টমন্ত্র জপ্ করিতে বসিলেন। অভয়াসুন্দরী ও পীতাম্বরকেও তিনি সেইরূপ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। একমনে, একপ্রাণে তাহারাও রোগিনীর পার্শ্বে বসিয়া—কাতরভাবে ভগবানকে ডাকিতে লাগিল।

সেদিন রোগিনীর রোগ বাড়িয়াছে খুব। রাত্রি আর কাটে না। মৃত্যুর ছায়া রোগিনীর মুখে বেশ পড়িয়াছে আর সে ছায়া যেন গৃহমধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সে ছায়ার কল্পনাতেই লোকে বিভীষিকা দেখিয়া থাকে। কে বলিতে পারে—এ ছায়ার কায়া কোথায় ?

কিন্তু সে বিভীষিকা দেখিবার অবসর এ গৃহে কাহারও নাই! ভগবানের নাম কীর্ত্তন করিতেই সকলে অনন্যমন। নাম কীর্ত্তনের ফল অচিরেই ফলিল। ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে ভক্তগণ ভগবানের করুণা হইতে বঞ্চিত হইল না। পরদিন প্রভাতে ডাক্তার আসিয়া যখন রোগিনীর নাড়ী পরীক্ষা করিলেন, তখন তাঁহাকে বলিতে হইল যে রোগিনীর জীবনের আর আশঙ্কা নাই। ডাক্তারের ধারণা হইয়াছিল যে তাঁহার ঔষধের গুণেই এমন অভাবনীয় পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। কিন্তু চিন্তামণির মুখে যখন তিনি সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন, তখন তিনি বলিলেন—

"ও সব গাঁজাখুরী কথা আমি বিশ্বাস করি না।"

কিন্তু ডাক্তারকে একদিন সে "গাঁজাখুরী" কথা বিশ্বাস করিতে হইয়াছিল। সেদিন তাঁহার একজন পরমাত্মীয় মৃত্যু-শয্যায়!

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

তরুলতা আরোগ্যপথে দাঁড়াইতে চিন্তামণির একটা চিন্তা দূর হইল বটে, কিন্তু আর একটা চিন্তায় তিনি অভিভূত হইয়া পড়িলেন। জনাবালি যখন তাঁহাকে বলিল যে সতুর বাড়ী ফিরিতে এখন প্রায়ই অধিক রাত্রি হয় এবং জনাবালির কথা সে বড় একটা এখন আর গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না, তখন চিন্তামণির মুখে প্রগাঢ় চিন্তা-রেখা পড়িল। পরের মঙ্গল-চিন্তা করাই যাঁহাদের জীবনের কার্য্য, তাঁহাদের চিন্তাভার আর কমিবে কেমন করিয়া? চিন্তামণির চিন্তা বাড়িতেই লাগিল।

চিন্তামণির ধারণা কিন্তু, সংসারের চিন্তা তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিতে পারে না। তাঁহার সুখ—কর্ত্তব্যপালনে, তাঁহার আনন্দ—পরের হিতকামনায়।

হায় চিন্তামণি, তথাপি তুমি বলিতে চাও—সংসারের চিন্তা তোমায় ব্যাকুল করিতে পারে না। চিন্তামণি চিন্তা ছাড়িলে চিন্তামণি নামের সার্থকতা কি? যিনি জগত-চিন্তামণি, সাধনাবলে যদি কখনও তাঁহার সন্ধান পাও, তাঁহাকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিও দেখি! উত্তর পাইলে, সে বার্ত্তা জগৎকে জানাইও—জগতের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইবে।

স্বামীগত-প্রাণা অভয়াসুন্দরী কিন্তু স্বামীর সে চিন্তা দূর করিবার প্রয়াস পাইলেন। অভয়াসুন্দরী কহিলেন—

"তা'র আর কথা কি—সতুর বিয়ের বয়স হয়েছে, ওর বিয়ে থা দাও, তা' হ'লেই সব গোল মিটে যা'বে।"

স্ত্রীর প্রস্তাব শুনিয়া চিন্তামণি যদিও মনে মনে একটু লজ্জিত, ক্ষুব্ধ ও ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন, নিরাশার অন্ধকারে তবু যেন তিনি একটা আলো দেখিতে পাইলেন। অভয়াসুন্দরী তখনও বলিতেছেন—

"দোষ ত তোমাদেরই গো। বুদ্ধির বড়াই কর তোমরা, জান না, ধেড়ে আইবুড়ো ছেলে ঘরে রাখ্‌লে কি হয়? সতুর ব্যারাম হ'য়েছে, চ'খের ব্যারামও বোধ হয় হ'য়ে থাক্‌বে। ডাক এখন বদ্দি, করাও এখন চিকিচ্ছে—তা' না হ'লে ত রোগ সার্‌বে না। বৌমার চাঁদপানা মুখ দেখ্‌লেই সতুর আমার সব ব্যারাম সেরে যা'বে—বুঝেছ? ঐ বৌমাই হ'ল বদ্দি, আর বৌমাই হ'ল ওষুধ—বুঝেছ?"

অনন্যোপায় চিন্তামণি শেষে সেই উপায়ই প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া স্থির করিলেন। সেরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ভিন্ন চিন্তামণির আর উপায় কি? অভয়া সুন্দরীর নিকট বিচারে তিনি পরাস্ত হইয়াছিলেন।

তখন সত্যেন্দ্রের বিবাহের উদ্যোগ-পর্ব্ব আরম্ভ হইল। সুন্দরী কন্যার সন্ধানে চিন্তামণি চারিদিকে লোকজন ঘটক প্রভৃতি পাঠাইতে লাগিলেন। সতুর বিবাহ কি তিনি যেমন তেমন কন্যার সহিত দিতে পারেন?

কিন্তু সুন্দরী কন্যা চাই বলিলেই ত আর সুন্দরী কন্যা পাওয়া যায় না। সেই কারণেই বিবাহের বিলম্ব ঘটিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে জনাবালির সহিত সত্যেন্দ্রের মনোমালিন্যও ক্রমে অধিকতর বাড়িয়া উঠিল। চিন্তামণির তখন আর চিন্তার সীমা রহিল না তথাপি চিন্তামণির ধারণা—সংসারের কিছুরই জন্য তাঁহার ভাবিবার আবশ্যক নাই।

স্বামীর চিন্তা, উৎকণ্ঠা ক্রমেই বাড়িতেছে দেখিয়া অভয়াসুন্দরী আবার পরামর্শ দিতে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু স্ত্রীর পরামর্শ স্বামী

এবার গ্রহণ করিলেন না। নিরতিশয় ঔদাসীন্যের সহিত চিন্তামণি কহিলেন—

"তা' হয় না গো, তা' হয় না। নাঃারের সহিত যদি সতুর বিয়ের কোনও উপায় থাকৃত, তা' হ'লে কি আর আমি চুপ্ ক'রে থাকৃতেম্? ওর বাপ্ হ'ল বংশজ। বংশজের মেয়ে আমি ঘরে আনি কি ক'রে বল দেখি? শুধু রূপ দেখে যদি বিয়ে দেওয়া চল্‌ত, তা' হ'লে আরমানি বিবিও ত ঘরে আনা যেতে পা'রত—বুঝ্‌লে?"

সে বিবাহের বিঘ্নটা যে কি, অভয়াসুন্দরী তাহা এতক্ষণে বুঝিলেন। সুতরাং অভয়াসুন্দরীর স্থির করিতে আর বিলম্ব হইল না যে সে বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ দিবার প্রয়োজন নাই—হয় ত বা অধিকারও নাই।

অভয়াসুন্দরীর পরামর্শ দিবার আকাঙ্ক্ষা যখন যুক্তির স্রোতে ভাসিয়া গেল, জনাবালি মিঞা তখন পরামর্শের নৌকায় হাল ধরিয়া বসিবার চেষ্টা পাইল। চিন্তামণিকে সে বুঝাইতে চাহিল যে খোদা জাতিরও সৃষ্টি করেন নাই, আর বংশজেরও সৃষ্টি করেন নাই। অতএব সে সকল তর্কবিতর্কের কথা তুলিয়া বিবাহের সম্বন্ধটা ভাঙ্গিয়া দিবার প্রয়োজন কি? "ছাতু বাবুর" বিবাহ দিতে বিলম্ব হইলে অথবা বিবাহটা অন্য কোনও স্থানে দিলে যে একটা মহা অনর্থ ঘটিবে, সে কথা চিন্তামণিকে বুঝাইতে জনাবালি বিস্তর চেষ্টা করিল। জনাবের তর্কযুক্তি শ্রবণানন্তর চিন্তামণি একটু হাসিলেন মাত্র। সে হাসির কারণ জনাবালি বুঝিতে না পারিয়া মনে মনে একটু ক্ষুণ্ণ হইল। কিন্তু তাহার সে ক্ষুণ্ণভাব ক্ষণেকের জন্য। জনাবালি ভাবিল—কথাটা হয় ত সে "বেকুফের" মত কহিয়াছে। তাহাতেই "বড়্‌দা" না হাসিয়া আর থাকিতে পারেন নাই।

সতুর বিবাহের কথা, পাত্রী সন্ধানের চেষ্টা যেমন চলিতেছিল, তেমনই চলিতে লাগিল। দিনের পর দিন কাটিয়া গেল—তবে তেমন সুখে নহে।

—০—
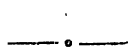
সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

হরিহর চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা নীহারিকার সহিত সত্যেন্দ্রের খেলাধূলা, মেলামেশা শৈশবে যে খুবই ছিল, সে পরিচয় পাঠকবর্গ বহুপূর্ব্বেই পাইয়াছেন। সেই খেলাধূলা, মেলামেশা হইতে উভয়ের মধ্যে ধীরে ধীরে একটু একটু করিয়া একটা কি জানি-কেমন ভাব যে জাগিয়া উঠিয়াছিল, তাহাকে কিছুতেই অস্বাভাবিক বলিতে পারা যায় না। সে ভাব, সে জাগরণের মূলে কুসুম-কীরিটী এক দেব-শিশুর পুষ্পায়ুধ পড়িতেই মূল সতেজ হইয়া উঠিল। অন্যের অস্ত্রে মূল ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়; কিন্তু পুষ্প-ধনুর পুষ্পবাণের আঘাতে প্রণয়ের মূল অলৌকিক শক্তি লাভ করে। দেবতার এমনই আশীর্ব্বাদ!

শিশু-দেবতার উৎপাত উপদ্রব যখন খুব বেশী বাড়িয়া উঠিল, তখন সত্যেন্দ্র ও নীহারিকার দেখাশুনাও একটু একটু করিয়া বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। কারণ ক্রমেই তাহারা বড় হইয়া উঠিতেছে— তাহাদের বয়স বাড়িতেছে। বয়স বাড়িলে শৈশব সঙ্গিনীদের সহিত এ দেশের পুরুষগণের মিলিবার মিশিবার উপায় নাই—এমন কি, অনেক ক্ষেত্রে সাক্ষাৎলাভও ঘটিয়া উঠে না। অনেকের মত—এ ব্যবস্থা সমীচিন। কাহারও কাহারও ধারণা—এ দেশ অভিশপ্ত দেশ বলিয়াই এদেশে এমন কুপ্রথার প্রচলন হইয়াছে। ভিন্ন লোকের ভিন্নরুচি। সে কথা তুলিয়া আমাদের তর্কজালে পড়িবার আবশ্যক কি?

সামাজিক-শাসন—তাহার উপর চিন্তামণির কঠোর ব্যবস্থা যখন সত্যেন্দ্র ও নীহারিকাকে পরস্পরের দর্শন-পথের আর পথিক হইতে

দিল না, তখন তাহাদের পরস্পরের দর্শনাকাঙ্ক্ষা অধিকতর প্রবল হইয়া উঠিল। সেই আকাঙ্ক্ষাবশেই যাত্রার দলে যাইবার ঘটাটা সত্যেন্দ্রের এত অধিক। যাত্রা-বাড়ীর সম্মুখেই হরিহরের বাস্তু-ভিটা। হরিহরের শয়ন-গৃহের জানালার ফাঁক দিয়া সত্যেন্দ্র একখানি সুন্দর মুখ দেখিতে পাইত। ফাঁকের মুখ ফাঁকিতে দেখিয়া সত্যেন্দ্রের অবশ্য তৃপ্তি হইত না, বরং আকাঙ্ক্ষা অধিকতর বাড়িয়া উঠিত। কিন্তু তৃপ্তিলাভের অন্য উপায়ও ত আর নাই। বেচারা সত্যেন্দ্র একাকী বসিয়া বসিয়া ভাবিয়া আর কি করিতে পারে? শয়নে, স্বপনে, জাগরণে কেবল সেই মুখ-খানিই সে ভাবিত, আর মাঝে মাঝে খুব বড় এক একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিত। ভাবিয়া ভাবিয়া বেচারার নিদ্রাহার ছুটিয়া গিয়াছিল। নীহা-রিকা-চিন্তানলে পড়িয়া সত্যেন্দ্রের শরীরের লাবণ্যও যে নষ্ট হয় নাই, এমন কথাও বলা কঠিন। সুন্দর মুখের চিন্তা যাহার হৃদয় অধিকার করে, তাহার লাবণ্যদীপ্তি যে অচিরে বিনষ্ট হয়, সে কথা কে অস্বীকার করিবে? হায় প্রেম—হায় পঞ্চবাণ!

নীহারিকার অবস্থাও প্রায় সত্যেন্দ্রের অনুরূপ হইয়াছিল। ধনীর কন্যা হইলে প্রেমিকার প্রেমভাবটা—বিরহের ব্যথা বেদনাটা হয়ত একটু উৎকট হইয়া পড়িত, হয়ত তাহা লোক জানাজানি হইত। কিন্তু সে দরিদ্রের কন্যা। প্রিয়জন-বিরহ-বেদনা প্রাণের ভিতর তাহাকে চাপিয়া রাখিতে হইল, একা একাই তাহাকে বুঝিতে হইল, একা একাই তাহাকে ভাবিতে হইল, একা একাই তাহাকে শান্ত হইতে হইল। তাহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য তাহার কোনও প্রিয়সখী ছিল না, তাহার সেবা শুশ্রূষা প্রভৃতির জন্য তাহার কোনও পরিচারিকা ছিল না। যাহা স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম, তাহাই নীহারিকার আশ্রয় মাত্র হইল। নীহারিকার বুক ফাটিয়া গেল, কিন্তু মুখ তাহার কিছুতেই ফুটিল না।

তাহার মুখ ফুটিবে কেমন করিয়া? সে একে কুমারী—তাহার উপর সে দরিদ্রের কন্যা। তাহার মুখ ফুটিলে কি আর রক্ষা আছে! আর এরূপস্থলে কাহার মুখই বা ফুটিতে পারে? তবে মুখ না ফুটিলেও মুখে চ'খে যে অনেকের মনের ভাব ফুটিয়া উঠে না, এমন কথা বলাও বোধহয় চলে না। নৃত্যপরায়ণ পুষ্পধনুর জ্যা-নির্ঘোষ এমনই ভয়াবহ!

নীহারিকা চেষ্টা করিয়া তাহার মনের ভাব গোপন করিতে লাগিল। কিন্তু জননীর সতর্ক চক্ষু নীহারিকা কিছুতেই এড়াইতে পারিল না। সন্তানের ব্যথা, বেদনা কখনও কি সে চক্ষু এড়াইতে পারে?

নীহারিকার মাতা—দুর্গাবতী সকল কথা তাহার স্বামীর নিকট বলিল। হরিহর সে সম্বন্ধে অনেক ভাবিল, স্ত্রীর সহিত অনেক পরামর্শ করিল, মনে মনে অনেক সুখ, অনেক স্বাচ্ছন্দ্যের কল্পনা করিল। তাহার পর হরিহর একদিন অনেক আদর করিয়া সত্যেন্দ্রকে আপনাদের বাটীর মধ্যে ডাকিয়া আনিল। সেই অবধি সত্যেন্দ্রের এ বাটীতে যাতায়াতের মাত্রাটা খুবই বাড়িয়া গেল।

চিন্তামণি কিন্তু এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানিতে পারিলেন না। সত্যেন্দ্রের বাটী ফিরিতে বিলম্ব হইলে চিন্তামণি ভাবিতেন—"ছোঁড়াটা নিশ্চয়ই যাত্রার দলে জুড়ীর তান্ মার্‌ছে।"

যাত্রার দল ছাড়াইবার জন্য চিন্তামণি, দেশের জমীদার মহাশয়কে অনুরোধ করিয়া জমীদারী কাছারীতে সত্যেন্দ্রের একটী চাকুরী জুটাইয়া দিলেন। এখনও কিন্তু তিনি সত্যেন্দ্রের জন্য একটীও পাত্রী স্থির করিতে পারেন নাই। তাঁহার সঙ্কল্প—ঘাল ঘর ও সুন্দরী কন্যা না পাইলে তিনি সতুর বিবাহ দিবেন না। কিন্তু সতু সে কথা বুঝিবার অবসর পায় কি?

নির্ব্বোধ যুবক, পরিণাম বড় অন্ধকার!

———০———

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

সত্যেন্দ্রের অশেষ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জনাবালি যখন "ছাতুবাবুর" যথেচ্ছা-চারিতা কিছুতেই বন্ধ করিতে পারিল না, তখন সে "ছাতুবাবুর" উপর বিশেষ অভিমান করিল। কিন্তু জনাবালির সে অভিমান দেখিয়া সত্যেন্দ্র একটুও বিচলিত হইল না—কারণ তাহার বিশ্বাস, "জনাব-চাচা" এমন অভিমান প্রায়ই করিয়া থাকে।

জনাবালি এবার অভিমান করিয়া একটা নূতন কাণ্ড করিল। অন্যান্য সময়ে অভিমান করিয়া সে হয়ত বাড়ী চলিয়া যাইত, কি প্রস্তর-মূর্ত্তির মত নিশ্চল হইয়া বসিয়া থাকিত, কি "বড়্‌দার" কাছে নালিস করিত, কি এমনই একটা কিছু করিয়া বসিত। কিন্তু এবার এ সকলের মধ্যে একটা কিছুও সে করিল না। "ছাতুবাবু" কি করে, কোথায় যায়, তাহা ত সে পূর্ব্ব হইতেই জানিত। কিন্তু তথাপি "ছাতুবাবুর" খাঁটি খবরটা লইবার জন্য যাত্রা-বাড়ীর চারিপাশে গুপ্তভাবে সে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। জনাবালির ধারণা হইয়াছিল, জমীদার-সরকারে চাকুরী পাইয়া "ছাতুবাবু" শুধুই এখন যাত্রা করে না, "নাচ্‌নাওয়ালীর" নিকটেও বোধ হয় সে নৃত্য শিক্ষা করিতেছে।

দুই চারিদিন যাত্রা-বাড়ীর চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়াও জনাবালি যখন সত্যেন্দ্রের সঠিক সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারিল না, তখন সে যাত্রার দলের এক "ছোক্‌রাকে" "পাকড়াও" করিয়া সত্যেন্দ্র সম্বন্ধে অনুসন্ধান আরম্ভ করিল। জনাবালির প্রশ্নের পর প্রশ্নের উত্তরে "ছোক্‌রা" বলিয়া ফেলিল—সতুবাবু এখন আর প্রায় "আখড়াতেও" আসেন না,

আর "মহালাতেও" যোগদান করেন না। তাঁহার সন্ধান এখন হরিহর বাবুর নিকট পাওয়া যাইতে পারে। সন্ধ্যা হইতে রাত্রি বারটা পর্য্যন্ত সেইখানেই এখন তাঁহার "বসবাস"।

হরিহরবাবুর ঠিকা ভৃত্য উজীরের সহিত জনাবালির বিলক্ষণ সৌহার্দ্দ্য ছিল। উজীরের নিকট জনাবালি শুনিল—

"হোড়িহোড়্" বাবুর মাইয়া ছাতুবাবুকে পেয়ার করে—হতি পারে আস্নাই হইছে। সেই নেগে কোর্ত্তাবাবু আর গেন্নি-মাতে সোলা কর্তিছেন যে ছাতুবাবুর সাথে তানাদের মাইবার সাধি দেবা।"

কথাটা জনাবালি যখন শুনিল, তখন "বড়্দার" শুনিতেও আর বাকী রহিল না। জনাবালির সংবাদ শুনিয়া চিন্তামণি দুঃখে, ক্ষোভে, বিস্ময়ে, অভিমানে কেমন যেন একপ্রকার হইয়া গেলেন। কেমন চিন্তামণি, আর ভাবিবে কি—সংসারের ধার তুমি কিছুই ধারণা—সংসারের ভাবনা তোমায় পাগল করিতে পারে না?

জনাবালির নিকট সকল কথা শুনিয়া চিন্তামণি স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন। সে সংবাদ জনাবালির মুখে অভয়াসুন্দরীও শুনিল আর পীতাম্বরও শুনিল। তাহা শ্রবণানন্তর অভয়াসুন্দরী খুব বড় একটা নিশ্বাস ফেলিয়া পাখাখানা হস্তে লইয়া স্বামীকে ব্যজন করিতে লাগিল। পীতাম্বর আরামের দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল—"আঃ—বাঁচা গেছে। ছোঁড়া এখন বাবার দু'চক্ষের বালাই হ'বে—তাইত আমি চাই।"

এমন সুসংবাদটা পীতাম্বর তরুলতাকে আনন্দসহকারে দিতে গিয়াছিল। কিন্তু তরুলতার গাম্ভীর্য্য দেখিয়া পীতাম্বরকে অপ্রতিভ হইতে হইল। তরুলতা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিয়াছে, তাহার স্বামী কাহারও কোনও কথায় যেন আর না থাকে।

ওদিকে সত্যেন্দ্র ও হরিহর প্রভৃতিরও শুনিতে বাকী রহিল না যে

"বড়্‌দা" সকল কথাই শুনিয়া ফেলিয়াছেন। তাহাতে সত্যেন্দ্র লজ্জা ও সঙ্কোচে অধোবদন হইল। কিন্তু হরিহর তাহাকে বুঝাইয়া দিল—

"সে ত ভালই হয়েছে বাবা! বড়্‌দা যে এত শীঘ্র এ খবরটা আপনা আপনি শুনে ফেল্‌বেন, তা' আমি মনেই কর্‌তে পারি নে। যতদিন না শুনেছিলেন, ততদিনই তোমার ভয়ের কারণ ছিল। এখন যখন তিনি সব শুনেছেন, তখন ত ভয় অথবা লজ্জার কোনও কারণ দেখ্‌তে পাচ্ছি না।"

এ সকল কথার উত্তরে সত্যেন্দ্র কোনও কথাই কহিল না। হরিহর বলিতে লাগিল—

"আর দেখ বাবা, তুমি ত কারও দয়ার উপরও বেঁচে নেই যে তোমায় অত ভয় ক'রে চল্‌তে হ'বে। তোমার তালুক মুলুক একটু আধটু আছে, তা'র উপর চাকরীও আছে। তোমার ভাবনা কিসের বাবা?"

তালুক মুলুক ও চাকরীর কথায় সত্যেন্দ্র অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া পড়িল। সলজ্জভাবে সে কহিল—

"তালুক, চাক্‌রী, সে সবই ত বড়্‌দা'র দয়ায়। ওসকল কথায় আপনারা কোনও কথা কবেন না—এই আমার অনুরোধ।" হরিহর বলিল—

"তা' বৈকি বাবা, ও সকল কথায় আমাদের থাকাই বা কেন? তবে কিনা—"

"আর তবে কিনায় কাজ নেই"—বলিয়া দুর্গাবতী স্বামীকে একটু ভৎর্সনা করিল। স্ত্রীর ভৎর্সনায় স্বামী নীরব হইয়া গেল।

দুর্গাবতী সত্যেন্দ্রকে কহিল—

"তুমি ও ঘরে জল খাওগে বাবা! উনি কি বলেন, না বলেন, তা'তে তোমার কাণ দেবার আবশ্যক দেখি নে।"

সত্যেন্দ্র চিন্তিতহৃদয়ে গৃহান্তরে চলিয়া গেল। দুর্গাবতী পুনরায় স্বামীকে ভর্ৎসনা করিয়া কহিল—

"হ্যাঁ গা, ঐসব কথাই বুঝি ওর সঙ্গে কইতে হয়। তুমি কি জান না যে বড়্দা' হ'তেই ওর সমস্ত। বিপিনকৃষ্ণ ত কেবল দেনাই রেখে গিছ্ল।"

"আরে বাবু জানিত সব। কিন্তু জান্লে কি হ'বে—মেয়েটাকে পার কর্‌তে হ'বে ত; কাজেই দুটো কথা কইতে হয়।"

অঞ্চলস্থিত চাবির তোড়াটি ভূমিতল হইতে কুড়াইয়া লইয়া দুর্গাবতী কহিল—

"কথা কইতে জান, না ছাই কর্‌তে জান। অমন সব কথা কইলে লোকে যে বিরক্ত হয়, সে জ্ঞানটা তোমার আছে কি?"

অঙ্গভঙ্গী করিয়া হরিহর কহিল—

"তেমন বিশ্বাসটা আমার আদৌ নেই। আমার বিশ্বাস—আমার ধারণা, যে উপকার পায়, সে উপকারীর মৃত্যু-কামনা করে। উপকারী বেঁচে থাক্‌লে, তা'কে দেখে উপকৃতের লজ্জা বোধ হয়, সে ভাবে—যা'র দয়ায় সে মানুষ হ'ল, সে বেঁচে থাক্‌লে, তা'র কাছে মাথা নামিয়ে থাক্‌তে হ'বে। কৃতঘ্ন যা'রা, তা'দের আচার ব্যবহারটা ঠিক্ এই রকম। তবে কৃতজ্ঞ যা'রা তা'দের কথা স্বতন্ত্র।

"তুমি কি?—বড়্দা'র উপকার আমরা কিছু পাই নে কি?"

"ওসব কথা ছেড়ে দাও। ওসব কথা মনে রাখ্‌তে গেলে আর সংসার করাও চলে না আর মেয়ের বিয়েও হয় না।"

"আমার মেয়ের আবার বিয়ের ভাবনা! অমন রূপ, অমন গুণ!"

"থাম—থাম—ক্ষেমা দাও। রূপ গুণ থাকে থাক্—কিন্তু কুলটা যে পোকায় খেয়ে ফেলেছে, সে খবরটা রাখা হয়েছে কি? যেটা

হয়েছে অবশ্য কিছু অর্থলোভে তোমায় ঘরে এনে—তোমায় ঘরণী ক'রে।"

দুর্গাবতীর মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিল। হরিহর সে অপ্রিয় প্রসঙ্গ ছাড়িয়া দিয়া স্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিতে লাগিল—কবে, কোন্ স্থানে, কিরূপ উপায়ে সত্যেন্দ্রের সহিত নীহারিকার বিবাহকার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন করা যাইতে পারে।

সত্যেন্দ্র তখন পার্শ্বের গৃহে অবস্থান করিতেছিল। সে রাত্রে তাহার শরীরটা তেমন ভাল ছিল না। হরিহরের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া তাহার শরীরটা আরও খারাপ হইয়া পড়িয়াছিল। নীহারিকার কুসুম-কোমল অঙ্গুলী স্পর্শে তাহার "মাথাধরাটা" অনেকটা কমিয়াছিল বটে, কিন্তু কোনও মতেই সত্যেন্দ্রের দেহ মন সে রাত্রিতে আর সহজ অবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই।

সে রাত্রে সত্যেন্দ্রের বাটী ফিরিতে আরও অধিক বিলম্ব হইল। বাটী ফিরিবার সময় সত্যেন্দ্র হরিহরের নিকট শুনিয়া আসিল—তাহার বিবাহ-কার্য্য কলিকাতাতেই হইবে। কলিকাতায় হরিহরের এক পরমাত্মীয় আছে—তাহারই আগ্রহাতিশয্যে এইরূপ ব্যবস্থা করিতে হইতেছে।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

তীর্থদর্শনের উদ্দেশ্যে চিন্তামণিকে কিছু দিনের জন্য স্বগ্রাম ছাড়িতে হইল। তরুলতা ধরিয়া বসিল—সেও শ্বশুর শাশুড়ীর সঙ্গে যাইবে। অভয়াসুন্দরী, বধূমাতাকে অনেক বুঝাইয়া পড়াইয়া নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিল বটে, কিন্তু তরুর অনুরোধ, অনুনয় ও চক্ষের জল দেখিয়া চিন্তামণি তাহাকে সঙ্গে না লইয়া আর থাকিতে পারিলেন না। পুত্রবধূর তীর্থযাত্রায় অভয়াসুন্দরীর ঘোর আপত্তি। সে স্বামীকে কহিল—

"তা'ও কি কখনও হয় গা! একে বৌমা এই ব্যারাম থেকে উঠেছে—নতুন শরীর—হিম ঠাণ্ডা লাগ্‌লে, উপবাস, অত্যাচার কর্‌লে, আর কি রক্ষা থাকৃবে গা?"

চিন্তামণি কহিলেন—

"বৌমা রোগ থেকে উঠেছে ব'লেই তা'র একবার বাইরে ঘুরে আসা উচিত। হাওয়া বদ্‌লালে বৌমার শরীর খুব শীঘ্রই সেরে উঠ্‌বে। আর হিম, ঠাণ্ডা, উপবাস, অত্যাচারের কথা যা' বল্‌ছ—সেটা বিশেষ কিছু নয়। সেদিকে আমরা একটু চ'খ রাখ্‌লেই সব ঠিক্ হ'য়ে যা'বে।"

"তা' না হয় হ'ল। কিন্তু পীতুর খাওয়া-দাওয়ার কষ্ট হ'বে ত?"

"কেন? বামুন, চাকর, ঝি সবই রইল—পীতুর কষ্ট হ'বে কিসে?"

"হাজার থাক্—তবু—"

"ঐ তবুটা আমি একেবারেই ভালবাসি না। একজন না থাক্‌লে

খাওয়া চল্‌বে না, থাকা চলবে না, বাঁচা চল্‌বে না,—এ রকম অভ্যাস ত ভাল নয়। মানুষের চিরকালই কি সবাই থাকে ?"

অভয়াসুন্দরী দারুণ বিরক্তির স্বরে কহিল—

"তোমার সব এক রকমের কথা। ওতে যে বৌমার অকল্যাণ হয়।"

"আমি বৌমার কথা বলি নে—আমাদের কথাই বল্‌ছি। আর মঙ্গলামঙ্গলের কথা যা' ব'ল্‌ছ—সে সব অদৃষ্টের কথা। তুমি, আমি ভেবে তা'র কিছু কর্‌তে পারি কি ?"

"তবু—"

"আবার "তবু"! বিধির বিধানে "তবু," "কিন্তু"—এসব কিছুই নেই। যা' আছে, তা' ধ্রুব—যা' হয়, তা' নিত্য সত্য—যা' হ'বে তা' আর কেউ রোধ কর্‌তে পা'রবে না। ওসব ভেবে আর কাজ নেই। মন হয়েছে, বেরিয়ে পড়—বস্ চুকে গেল ঝঞ্ঝাট।"

"সতুর ব্যবস্থা কি রকম ক'রে যাচ্ছ ?"

চিন্তামণি এইবার একটু হাসিলেন। অভয়াসুন্দরী জিজ্ঞাসা করিল—

"হাস্‌লে যে ?"

"হাসি এল—কাজেই হাস্‌লেম্—বস্ চুকে গেল ঝঞ্ঝাট। অত আর জেরা কর কেন—জেরার জবাব দেওয়া কি সহজ ব্যাপার গা ?"

"আঃ বল না—সতুর ব্যবস্থা কি কর্‌বে ?"

"কিছু না। সেও বিধির বিধানে। তা'র বিধাতাপুরুষ এখন হরিহর। হরিহর সে ব্যবস্থা কর্‌বে—আমি করবার কে ?"

কথাটা ভারী অভিমানের। অভয়াসুন্দরী সে কথা বুঝিয়া আর কোনও কথা কহিলেন না। চিন্তামণি বলিতে লাগিলেন—

"তাই ব'লে মনে ক'র না যেন, সতুর উপর আমি রাগ করেছি। সতুর সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেছি। সে বাপ্ মা মরা ছেলে।

আমার প্রতি কর্ত্তব্যের আদেশ ছিল—তা'কে মানুষ করা। সাধ্যমত সে চেষ্টা করেছি। মানুষ হয়েছে কিনা—তা' জানি না। তবে সে যে আমার সেবার উপর আর নির্ভর করে না, সেটা বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছি। বস্‌ মিটে গেল।"

অভয়াসুন্দরী বুঝিত—কাহারও উপর অভিমান হইলেই তাহার স্বামী এইরূপ কথা কহিতেন। সুতরাং সে সম্বন্ধে অভয়াসুন্দরী আর কোনও কথাই কহিল না। জিনিস পত্র গোছগাছ করিতে, সংসারের সুব্যবস্থা করিতে সে দিনটা প্রায় সবটাই কটিয়া গেল। তাহার পর-দিবস প্রভাতে তীর্থযাত্রার নির্দ্দিষ্ট সময়। উদ্যোগ-পর্ব্ব খুবই চলিতে লাগিল। সে পর্ব্বে নীলুও খুব মাতিয়া উঠিয়াছে। কারণ, সেও একজন তার্থযাত্রী। তরু যখন তীর্থ দর্শনে যাইতেছে, তখন নীলুকে ত যাইতেই হইবে। তাহার "দাদুবদাই" বলিয়াছেন—"নীলুই এ যাত্রার তীর্থ-প্রদর্শক। নীলু না যাইলে চলিবে কেন?"

আসল কথা—মা ছড়িয়া কোথাও থাকা নীলুর পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং তাহাকে সঙ্গে লওয়াই চিন্তামণি বিবেচনার কার্য্য মনে করিয়াছেন।

রাত্রি প্রভাত হইলে তীর্থযাত্রীগণ "মোটমাট্" সঙ্গে লইয়া "রেলওয়ে ষ্টেশনে" আসিয়া উপস্থিত হইল। "দেশের বড়্‌দাকে" গাড়ীতে তুলিয়া দিবার জন্য দেশের অনেক লোক ষ্টেশনে আসিয়াছিল। সত্যেন্দ্র ও হরিহরকেও সে জনতার মধ্যে অনুপস্থিত দেখা যায় নাই। জনাবালি কিন্তু "বড়্‌দা'কে" গাড়ীতে তুলিয়া দিতে আসে নাই। প্রিয়জনকে বিদায় দিবার জন্য ষ্টেশনে আসিতে সে একেবারেই পারে না।

টিকিট ক্রয় করিয়া, পাল্‌কী-বেহারাদের সঙ্গে ভাড়াবাবদে ঝগড়া-ঝাঁটি করিয়া পীতাম্বর যখন গাড়ীর নিকট উপস্থিত হইল, তখন গাড়ী

ছাড়িবার প্রায় সময় হইয়াছে। সকলকে যথাযোগ্য প্রণাম, নমস্কার, আলিঙ্গন, আশীর্ব্বাদ করিয়া চিন্তামণি গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন। অভয়াসুন্দরী, সতু ও পীতুকে নিকটে ডাকাইয়া তাহাদের মস্তক চুম্বন করিয়া খুব সাবধানে থাকিতে উপদেশ দিলেন। অনতিবিলম্বেই বাষ্পীয় শকটের বাঁশী বাজিয়া উঠিল—গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

সত্যেন্দ্রের বাটীতে জনাবালিকে এখন আর থাকিতে হয় না। সত্যেন্দ্র আপনার বন্দোবস্ত আপনিই করিয়া লইয়াছে। তথাপি জনাবালিকে একবার করিয়া সে বাটীতে যাইতে হয়। তাহার কতকটা কারণ—বড়্‌দা'র আদেশ, আর কতকটা কারণ সত্যেন্দ্রকে না দেখিলে জনাবালি স্থির থাকিতে পারে না। দেশের লোকে রঙ্গ করিয়া বলিয়া থাকে—সত্যেন্দ্র হাঁকাইয়া দিলেও সত্যেন্দ্রের বাটীতে অন্ততঃ একবার না যাইলে জনাবালির অন্ন পরিপাক হওয়া সুকঠিন।

কিন্তু হরিহরের ইচ্ছা নহে যে জনাবালি, সত্যেন্দ্রের সহিত আর এতটা আত্মীয়তা করে। সত্যেন্দ্রকে সে বুঝাইতে লাগিল যে, মুসলমানের সহিত এতটা আত্মীয়তা রাখিবার কোনও আবশ্যকতাই নাই।

কথাটা যদিও সত্যেন্দ্রের খুব মনের মত হইল না, তথাপি হরিহরের কথাই তাহাকে মানিয়া চলিতে হইল। সত্যেন্দ্র এখন রূপোন্মাদ—নীহারিকা-লাভের জন্য সে এখন বড়্‌দা'র সহিতও সকল সম্পর্ক ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। জনাবালির সহিত সম্পর্ক রহিত হওয়া তাহার পক্ষে আর বিচিত্র ব্যাপার কি?

জনাবালি যে সে কথা না বুঝিত, এমন নহে। কিন্তু বুঝিয়াই বা সে কিং করিবে! ভালবাসা কি লাঞ্ছনা, অপমান, অপবাদ, অত্যাচার গ্রাহ্য করে? জনাবালি সত্যেন্দ্রের বাটীতে যেমন যাইতেছিল, তেমনই যাইতে লাগিল। হরিহর তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া জনাবালিকে একদিন একটু শক্ত কথা বলিতে উদ্যত হইয়াছিল। কিন্তু জনাবালির লাঠির বহর দেখিয়া হরিহর শান্ত ভাবাপন্ন না হইয়া আর থাকিতে পারিল না।

জনাবালির গুণ অনেক—সে ভালও বাসিতে জানে, আবার লাঠিও চালাইতে পারে।

পীতাম্বরের সহিতও সত্যেন্দ্রের বিশেষ মনোমালিন্য ঘটিল। একেই পীতাম্বর, সত্যেন্দ্রের উপর চিরদিন অসন্তুষ্ট। তাহার উপর যখন সে দেখিল, সত্যেন্দ্র এখন তাহার পিতৃদেবেরও বিরুদ্ধাচারী হইয়া উঠিতেছে এবং জনাবালিকে হরিহরের দ্বারা অবমানিত করাইতেছে, তখন সে একেবারে জ্বলিয়া গেল।

এখন হইতে কথায় কথায় পীতাম্বর, সত্যেন্দ্রকে অনেক কথা শুনাইতে আরম্ভ করিল। সত্যেন্দ্র সে সকল কথার উত্তর দিত না বা দিতে পারিত না। তাহার কারণ—কতকটা ভয়, আর কতকটা লজ্জা। সত্যেন্দ্র ত পীতাম্বরের পিতার নিকট সকল প্রকারেই ঋণী। সে কেমন করিয়া আর পীতাম্বরের কথার উপর কথা কহিতে সাহস করে! তাহার উপর পীতাম্বরকে সে চিরদিনই ভয় করিত। সুতরাং পীতাম্বরের সহিত তর্কবিতর্ক করা তাহার পক্ষে একপ্রকার অসম্ভবই ছিল। কিন্তু মন ত আর কাহারও অধীনতা স্বীকার করে না। সত্যেন্দ্রের জিহ্বা যদিও সংযত ছিল, কিন্তু তাহার মন পীতাম্বরকে অজস্র গালিবর্ষণ না করিয়া আর থাকিতে পারিল না। পীতাম্বরকে কিরূপে বিপন্ন করা যাইতে পারে, কিরূপে তাহাকে সমাজের চক্ষে ঘৃণ্য করা যাইতে পারে, কি করিলে পীতাম্বর দুর্ব্বিসহ দুঃখ কষ্ট পায়, সেই সম্বন্ধে সত্যেন্দ্র মনে মনে জল্পনা কল্পনা করিতে লাগিল। কিন্তু দেশের সমস্ত লোক পীতাম্বরের পিতার খাতিরে পীতাম্বরের দিকে। এরূপ ক্ষেত্রে সত্যেন্দ্র কেমন করিয়া পীতাম্বরের বিরুদ্ধাচরণ করিতে সাহস করে! সুতরাং তাহার মনের কথা—আকাশ-কুসুম—মনেই মিলাইয়া গেল। আকাশ-কুসুমের দশা সকল ক্ষেত্রেই এইরূপ হইয়া থাকে।

ভাবিয়া চিন্তিয়া সত্যেন্দ্র একটা উপায় স্থির করিল। সে ভাবিল—গ্রামে আর থাকা হইবে না। তাহার বিষয়-সম্পত্তির যাহা আয় আছে, তাহাতে স্থানান্তরে যাইয়া বাস করিলেও তাহার দিনপাতের অসুবিধা ঘটিবার কারণ নাই। সেই ব্যবস্থাই সে সমীচীন বলিয়া স্থির করিল। নীহারিকা-প্রাপ্তির আশাতেই যে সত্যেন্দ্রের এরূপ ব্যবস্থা, তাহা না বলিয়া দিলেও পাঠকবর্গের বুঝিবার অসুবিধা হইবে না। মানুষ, স্বার্থের দায়ে, রূপের নেশায়, প্রবৃত্তির জ্বালায় অনেক কুব্যবস্থাকেও সুব্যবস্থা বলিয়া মনে করে। হায় স্বার্থ, হায় রূপ, আর হায় প্রবৃত্তি! তোমাদের প্ররোচনাতেই না মানুষ আর মানুষ থাকে না?

সত্যেন্দ্র শীঘ্রই কলিকাতায় চলিয়া গেল। এই সময়ে কলিকাতায় যাইবার তাহার একটু সুযোগও ঘটিয়াছিল। কলিকাতার একজন সম্পন্ন ভদ্রলোক সেই সময়ে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিতেছিলেন যে তাঁহার জমীদারি তত্ত্বাবধানের জন্য একজন কর্ম্মদক্ষ তত্ত্বাবধায়কের প্রয়োজন আছে—মাসিক বেতন—পঞ্চাশ টাকা। "বড়্দা'র" নিকট "জমীদারি মহাজনী" সত্যেন্দ্র বেশ ভাল করিয়াই শিখিয়াছিল। দেশের জমীদারের সেরেস্তায় কার্য্য করিয়াও তাহার শিক্ষাটা বেশ পাকা রকমেরই হইয়াছিল। সেই চাকুরী লাভের জন্য সত্যেন্দ্র সাহস করিয়া কলিকাতায় রওনা হইল। চাকুরী না পাইলেও সত্যেন্দ্রের হতাশ হইবার কারণ নাই। নীহারিকার সহিত তাহার বিবাহ কলিকাতাতেই ত হইবে!

চিন্তামণির বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, অন্তরঙ্গ কুটুম্ব কলিকাতা সহরে অনেক। তাহাদের সাহায্য ও "সুপারিশে" সত্যেন্দ্রের চাকুরী লাভ হইতে বিলম্ব হইল না। চাকুরী পাইয়া হরিহরকে সে পত্র লিখিল—কলিকাতায় সে এখন স্বতন্ত্র বাসা করিয়াছে। ইচ্ছা হইলে

তাঁহারা আসিয়া সেই বাসাতেই থাকিতে পারেন। বাসার অনতিদূরেই গঙ্গা—গঙ্গাস্নানের সেখানে বিশেষ সুবিধা।

স্ত্রী ও কন্যা সঙ্গে লইয়া হরিহর গঙ্গাস্নান করিতে আসিল। গঙ্গায় তাহারা ডুবিয়াছিল কিনা—দেশের লোক সে সংবাদ পায় নাই। তবে হরিহর আর দেশে ফিরিল না। সত্যেন্দ্র ও হরিহরের দেশের বাটীতে চাবি-তালা পড়িল।

জনাবালির তাহাতে অশান্তির আর সীমা নাই। সে প্রত্যহ তিন চারিবার করিয়া সত্যেন্দ্রের বাটীর "মরিচাধরা" তালাটা দেখিয়া যাইত, আর জানালা বন্ধ বাড়ীটার দিকে অনিমিষ-লোচনে চাহিয়া থাকিত। এত ব্যাকুলতাতেও সত্যেন্দ্রের বাটীর "মরিচাধরা" তালাটা খসিয়া পড়িল না। হরিহরেরও উদ্দেশ নাই। দেশের লোক বিদ্রূপ করিয়া বলিতে লাগিল—হরিহরের গঙ্গালাভ হইয়াছে—শ্রাদ্ধাধিকারী বোধ হয়—সত্যেন্দ্র!

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

"দেশের বড়্‌দা" দেশে না থাকায় দেশের সে শ্রী সম্পদ, সে সজীবতা —সমস্ত যেন নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সকলের দ্বারে দ্বারে যাইয়া সে কুশল জিজ্ঞাসা, বাঁধাবটতলায় সেই বৈঠক, আর্ত্তের প্রতি সেই সমবেদনা, অশিষ্টকে সেই শাসন, আবাল-বৃদ্ধের সহিত সেই আত্মীয়তা, এক "দেশের বড়্‌দা" ভিন্ন আর কে করিতে পারে—কাহার করিবার শক্তি আছে? দেশের লোক "দেশের বড়্‌দা'র" অভাবটা খুবই অনুভব করিতে লাগিল।

চিঠিপত্র "বড়্‌দা'কে" অনেকই লেখা হইয়াছিল, কিন্তু "যাই যাই" করিয়া—"বড়্‌দা'র" সহজে আর আসা হইল না। বৃন্দাবন, মথুরা, প্রয়াগ, বারাণসী প্রভৃতি ভ্রমণ করিয়া তিনি অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভ করিতেছিলেন। সহজে তিনি আর বাটী ফিরিতে চাহিতেছিলেন না। এক পীতাম্বর ছাড়া তাঁহার সংসারের সকলেই প্রায় তাঁহার সঙ্গে আছে। সেই কারণেই তীর্থ-ভ্রমণ বোধ হয় তাঁহার এত মিষ্ট লাগিতেছিল। পীতাম্বর ও সত্যেন্দ্র আপনাদের পথ এখন আপনারাই চিনিয়া লইয়াছে। তাহাদের জন্য চিন্তামণির এখন বিশেষ চিন্তা করিবার আবশ্যকই বা কি?

কিন্তু চিন্তামণি যখন শুনিলেন, জনাবালি পীড়িত, সে উত্থান-শক্তি-রহিত, "বড়্‌দা', বড়্‌দা" করিয়া তাহার প্রাণ বাহির হইতেছে, তখন চিন্তামণির আর প্রবাসে মন টিকিল না। চিন্তামণিকে এইবার আবাসে

ফিরিতে হইল। জনাবালি—চিন্তামণির ভক্ত। ভগবান ভক্তকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না—চিন্তামণি থাকিবেন কি প্রকারে ?

"বড়্দা"র জন্য জনাবালির পূর্ব্ব হইতেই মন খারাপ হইয়াছিল। সত্যেন্দ্রের দেশত্যাগে তাহার মন আরও খারাপ হইয়া গেল। দিবারাত্র ভাবিয়া ভাবিয়া জনাবালির শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল। আমাশয়-রোগে সে এখন মৃত্যু-শয্যায় !

চিন্তামণি দেশে ফিরিয়া, বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন না করিয়াই যখন জনাবালিকে দেখিতে গেলেন, তখন জনাবালির শিয়রে এক ফকির বসিয়া গজলের সুরে গাহিতেছিলেন—

কো ব্রাহ্মণ, কো মুসল্মা
কোন্ হ্যায় কেরেস্তান্,
উন্হিসে সব পয়দা হুয়ি
উন্হিকো সন্তান্।
ব্রাহ্মণ দেখো ত রাম্ বোলো ভাই
কর্না উহি ধেয়ান্,
রহিম্ রসুল্ ফকৎ বোলো
যব্ দেখো মুসল্মান্।
গড্ বোল্না মানা নেহি হ্যায়
যব্ দেখো গে কেরেস্তান্,
জুদা কর্না বিল্কুল্ গুণা
একি ভগওয়ান্।

ফকির জনাবালির গুরু। শিষ্যের পীড়ার সংবাদ তাঁহাকে কেহ না পাঠাইলেও মহাপ্রস্থানের পথে শিষ্যকে নির্ভীক পথিক করিয়া দিবার

জন্য তিনি স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। চিন্তামণি তাঁহাকে সেলাম্ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"জনাব্ কেমন আছে বাবা ?"

ফকির সাহেব মৃদু হাসিয়া কহিলেন—

"বেটা ত আভি যানে ওয়াস্তে তৈয়ার্। তেরি লিয়ে জনাব্ ঠায়ের্ গেয়ি। আও বেটা, জনাবকো জনাবী গদ্দিমে উঠানে কি লিয়ে তৈয়ার হো। অয় খোদা—অয় খোদা—অয় খোদা।"

ফকির রোগীর শয্যা ছাড়িয়া ভূমিতলে নামিয়া দাঁড়াইলেন। চিন্তামণি, ফকির সাহেবের স্থান অধিকার করিলেন।

জনাবালি বড়্দা'র আগমন-বার্ত্তা বহু পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিল। ফকির-গুরুর সহিত "বড়্দা" কথা কহিতেছিলেন বলিয়া জনাব, "বড়্দা'র" সহিত এতক্ষণ কথা কহিবার সুযোগ পায় নাই। সুযোগ পাইয়া জনাবালি "বড়্দা'র" হস্ত দুইখানি ধরিয়া আপনার বুকের উপর রাখিয়া আবেগ ভরে ডাকিল—

"বর্দা'—বর্দা' গো !"

কারুণ্য রসাপ্লুত চিন্তামণি উত্তর দিলেন—

"কি জনাব, কি দাদা ?"

জনাবালি উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া শয্যাতলে সে লুটাইয়া পড়িল। আর তাহার বাঙ্নিস্পত্তি হইল না। ফকির, শিষ্যের মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া কহিলেন—

"বাস্—খতম্ !"

চিন্তামণি, জনাবালির বুকের উপর হস্ত রাখিয়া অনেকক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিলেন। দেশের লোক তখন জনাবালির কুটীর-দ্বারে জড় হইয়াছে। হিন্দু, মুসলমান ভ্রাতাগণকে একত্রিত করিয়া চিন্তামণি,

শবদেহ সমাধি-স্থানে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিলেন। মুসলমান-ভ্রাতাগণ শবাধার বহন করিয়া লইয়া চলিল—হিন্দু-ভ্রাতারা তাহাদের অনুসরণ করিল।

জনাবালিকে "কবর" দিবার পর সকলেই ফকিরের অনুসন্ধান করিতে লাগিল। কিন্তু তাঁহার আর সন্ধান পাওয়া গেল না। আপন কার্য্য সমাধা করিয়া ফকির তখন কোথায় চলিয়া গিয়াছেন—কে তাহার সন্ধান জানিবে?

———o———
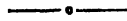
দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

জনাবালির মৃত্যু-উপলক্ষে শোক প্রকাশের জন্য কোনও স্মৃতিসভার অনুষ্ঠান না হইলেও বাঁধা বটতলার বিরাট বৈঠকে সহৃদয় ব্যক্তিগণ মৃতব্যক্তির যেরূপ গুণানুকীর্ত্তন করিলেন, তাহাতে মনে করা যাইতে পারে যে গুণ-কীর্ত্তনের ফলে অমরত্ব লাভে যদি মানুষের অধিকার থাকে, তবে জনাবালিও অমর হইয়াছে। এ সভায় কথার "কর্‌তপ্‌" আদৌ চলে নাই, বক্তৃতা-স্রোত আদৌ বহে নাই। লোকে যাহা বলিয়াছিল, তাহা লোকের মনের কথা—প্রাণের ব্যথা। এরূপ প্রাণের কথা শুনিলে মনে করিতে পারা যায় যে ভাল লোকের মৃত্যুর পর চেষ্টা করিয়া, সুপারিস্‌ করিয়া স্মৃতি-সভার অনুষ্ঠান করিবার একেবারেই আবশ্যক নাই। যাঁহার অদর্শনে লোকে অভাব অনুভব করে, যাঁহার স্মৃতি স্মরণ করিয়া লোকে সত্য সত্যই নয়ন-জল ফেলিয়া থাকে, যাঁহার কথা কীর্ত্তন করিয়া লোকে অশান্ত প্রাণকে সান্ত্বনা দেয়, তাঁহার জন্য লোকের অজ্ঞাতে একটা লোক-মতের সৃষ্টি হয়। তাঁহার স্মৃতি জাগাইয়া রাখিবার জন্য আর চেষ্টা করিয়া স্মৃতি-সভার আয়োজন করিতে হয় না। তাহা যদি করিতে হইত, তবে জগতে যাঁহারা মহৎ বলিয়া পরিচিত, তাঁহাদের স্মৃতির আর আদর থাকিত না। সভ্যতাদৃপ্ত মানব এ কথা বুঝিয়াও বুঝিতে চাহে না—ইহাই সমধিক আশ্চর্য্যের বিষয়। একথা বুঝিলে যে একালের অনেক স্মৃতি সভা বন্ধ হইয়া যায় এবং সে সকল স্মৃতি সভার "ঝাঁজ্‌" যে অনেক প্রাণীকে আর দুঃখ যন্ত্রণা দেয় না—এ কথা বেশ বলা যাইতে পারে।

জনাবালির গুণকীর্ত্তন সাঙ্গ হইলে বাঁধা বটতলার গ্রাম্য সম্মেলনে অনেকেই অনেক কথার অবতারণা করিল। কতদিন পরে তাহারা আজ তাহাদের "বড়্দাকে" পাইয়াছে—তাহাদের কথার কি আর শেষ আছে?

কথায় কথায় বিচার-বিবেচনাহীন সত্যেন্দ্রের কথা উঠিল। চিন্তামণি শুনিলেন—হরিহর চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা নীহারিকার সহিত সত্যেন্দ্রের বিবাহ হইয়া গিয়াছে এবং তাহারা সকলেই কলিকাতায় বসবাস করিতেছে। এই সংবাদ শুনিবার জন্য চিন্তামণি পূর্ব্ব হইতেই এক প্রকার প্রস্তুত হইয়াছিলেন। সুতরাং তাহা শ্রবণানন্তর তিনি তেমন বিস্মিতও হইলেন না অথবা তাঁহার তেমন মনঃপীড়াও জন্মাইল না। তিনি কেবলমাত্র বলিলেন—"তা' ভালই হয়েছে। কিন্তু সে দেশ-ছাড়া হ'ল কেন?"

সে কথার উত্তরে কেহ বলিল—"লজ্জায়", কেহ বলিল—"ভয়ে", আর কেহবা বলিল—"চাকুরীর লোভে।"

চিন্তামণি কহিলেন—

"সে যখন বিয়ের খাতিরে কুল নষ্ট করেছে, প্রবৃত্তির দাস হ'য়ে সমাজ ছেড়েছে, তখন তা'র মুখ আর আমি দেখ্‌ছি না। তা'র যা' ইচ্ছা, সে তাই করুক্ গে—আমি তা'তে কথা ক'বনা। কিন্তু সে দেশ ছাড়্‌ল কেন? তা'কে তোমরা ব'লে পাঠাও, তা'র কোনও ভয় নেই—দেশের ছেলে সে দেশে এসে বাস করুক্। দেশের লোক দেশ ছেড়ে কল্‌কাতায় বসবাস কর্‌লে দেশের শ্রী-সম্পদ আর থাকে কেমন ক'রে বল? তা'কে আমার নাম ক'রে লিখে পাঠাও—সে দেশে ফিরে আসুক, কেউ তা'র উপর অত্যাচার কর্‌বে না।"

তাঁহার ব্যক্তব্য শেষ করিয়া চিন্তামণি আপন গৃহাভিমুখে অগ্রসর

হইলেন। সে রাত্রির মত বাঁধা বটতলার সভা ভঙ্গ হইয়া গেল। সকলে বলাবলি করিতে লাগিল—"বড়্‌দা' আজ ভারী চটেছেন। চটি-বারই ত কথা। বড়্‌দা' কি আর সহজে চটেন! আমরা হ'লে ত খুন ক'রে খুনই হ'য়ে বস্‌তেম্‌। নেহাত্‌ বড়্‌দা ব'লেই সত্য ছোঁড়া এ যাত্রা রক্ষা পেল।"

হরিহরের উপরও অনেকে অনেক মন্তব্য প্রকাশ করিল। হরি-হরের স্ত্রী ও কন্যাও সে মন্তব্যের কশাঘাত হইতে পরিত্রাণ পাইল না। দায়ীত্বহীন সমালোচকবৃন্দের ধারাই ঐরূপ। মন্তব্য প্রকাশ কালে তাহারা বুঝিতে পারে না—কাহাকে কি কথা বলিতে হয়।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

নীহারিকা এখন সত্যেন্দ্রের গৃহের গৃহিনী। কিন্তু তাহার বয়স অল্প—পিত্রালয়েও গৃহস্থালী সম্বন্ধে সে কোনও শিক্ষাই পায় নাই—তাহার উপর সবেমাত্র তাহার বিবাহ হইয়াছে। সুতরাং গৃহিনী-পনা জানেও না আর করিতেও পারে না।

সংসারের কাজকর্ম্ম যে নীহারিকা করে, এরূপ ইচ্ছাও সত্যেন্দ্রের নাই। সংসারের কাজকর্ম্ম করিবার জন্য দাসদাসী ত তাহার অনেক আছে। নীহারিকা সে সকল কাজকর্ম্ম করিবে কেন? প্রেমিক সত্যেন্দ্র তাহার রূপবতী পত্নীকে কাচের পুতুলের মত সাজাইয়া কেবল তাহার পানে তাকাইয়া বসিয়া থাকিতে চাহে—সেইরূপ করিতেই সে ভালবাসে। তবে চাকুরীর দায়ে সে কার্য্যটা সত্যেন্দ্র তেমন করিয়া উঠিতে পারে না: চাকুরীর দায় বড় দায়!

নীহারিকার ইচ্ছা কিন্তু সংসারের সকল কাজকর্ম্ম সে একাই করে। তবে সে কার্য্য করিতে বেচারার শক্তিতে কুলায় না—সে কথা স্বতন্ত্র। তরকারি কুটিতে গিয়া নীহারিকা হাত কাটিয়া ফেলে, ভাঁড়ার বাহির করিতে গিয়া তৈল, লবণ, ঘৃত, চাউল, ময়দা, মশালা প্রভৃতি সে মিশাইয়া ফেলে, বাজারের টাকা দিতে যাইয়া কখনও এক টাকার জায়গায় সে আড়াই টাকা দেয়, আবার কখনও আড়াই টাকার জায়গায় আট আনা দেয়। ধোপার হিসাব রাখিতে যাইয়া কাপড় সে একখানাও মিলাইয়া লইতে পারে না—ধোপার সঙ্গে কেবল সে বচসা করে। এইরূপে সত্যেন্দ্রের সংসারে সকল জিনিসই বিশৃঙ্খল হইতে লাগিল। দাসদাসী-গণের চুরির সুবিধা তাহাতে খুবই হইল। চুরি, অপচয় নিবারণ

করেই বা কে আর দাসদাসীগণকে শাসনে রাখেই বা কে? পাকা গৃহিণী হইলে তবে সংসার সুশৃঙ্খলে চালাইতে পারা যায়। সে শিক্ষা অনেক কুমারীর হয় না বলিয়াই না পরের ঘরের বধূ হইয়া তাহাদের এত বিপদে পড়িতে হয় আর অপরকে তাহারা এত বিপন্ন করিয়া ফেলে? পাকা শ্বশুর, শাশুড়ী অথবা স্বামীর হস্তে পড়িলে অনেকের স্বভাবের পরিবর্ত্তন হয়—অনেকে সুশিক্ষায় সুশিক্ষিতা হয়। কিন্তু সে সৌভাগ্য যাহাদের কপালে ঘটে না, তাহাদেরই বিপদ সমধিক।

নীহারিকা সেইরূপ বিপদেই পড়িয়াছিল। আর সত্যেন্দ্রের বিপদও অল্প নহে। বন্দোবস্তের অভাবে অনেক সময়ে তাহার ভাল করিয়া আহারও জুটিত না। অথচ সামগ্রী-সম্ভারে ভাণ্ডার পরিপূর্ণ—খরচ পত্রের আর অবধি নাই। দাসদাসীর বিচার বিবেচনায় যদি সুচারুরূপে সংসার চলিত, তাহা হইলে গৃহস্থের আর ভাবনা থাকিত না।

সত্যেন্দ্রের নিষেধ না মানিয়া নীহারিকা যখন বিশেষ উদ্যমের সহিত সংসারের সকল কাজকর্ম্ম করিতে অগ্রসর হইল, তখন সত্যেন্দ্রের ভয় ও উৎকণ্ঠার আর সীমা রহিল না। তখন তাহার মনে হইতে লাগিল—বড়্দা'র আশ্রয় ত্যাগ করিয়া সে আদৌ ভাল করে নাই। কিন্তু পরক্ষণেই নীহারিকার রূপতরঙ্গ তাহার সমস্ত চিন্তা, সমস্ত যুক্তি বিস্মৃতি-সাগরে ডুবাইয়া দিত। সত্যেন্দ্র ভাবিতে লাগিল—পৃথিবীতে সকলই অসার, সার কেবল প্রেম। অনন্তরূপ-লাবণ্যময়ী নীহারিকাকে যখন সে পত্নীরূপে পাইয়াছে, তখন তাহার আর ভাবনা কিসের? যে তাহাকে ত্যাগ করে করুক্, একা নীহারিকাই তাহার সকল অভাব মোচন করিবে।

কিন্তু কেবল প্রেম করিয়া, প্রেমের কথা কহিয়া সংসারের জঠরানল নির্ব্বাপিত হইবার উপায় নাই। কাজেই সত্যেন্দ্রের প্রেম-তরুর মূল

ক্রমে ক্রমে একটু শিথিলতা প্রাপ্ত হইল ; ক্রমে ক্রমে নীহারিকাকে না জানিতে দিয়াও তাহার উপর সত্যেন্দ্রের একটু বিরক্তি আসিয়া পড়িতে লাগিল।

সেটা অবশ্য স্বাভাবিক। যাহার সংসার বিশৃঙ্খল, সময়ে যাহার আহার জুটে না, পেট ভরিয়া যে খাইতে পায় না, কদন্ন যাহাকে খাইতে হয়, অপরিচ্ছন্ন বস্ত্র যাহাকে পরিতে হয়, আবশ্যকের সময় আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি যে পায় না—প্রেমের নেশা তাহাকে আর কতদিন বিভোর করিয়া রাখিতে পারে ? সত্যেন্দ্রের প্রেম কতকটা গাঢ় ছিল—তাই সে এতদিন অবধি প্রেমের বাতি জ্বালিয়া বসিয়া থাকিতে পারিয়াছিল। কিন্তু সংসারের সু-ব্যবস্থারূপ সলিতার অভাবে আজ বুঝি তাহা নির্ব্বাপিত হয়।

সত্যেন্দ্র সে কথা বুঝিল—বুঝিয়া নিজ বুদ্ধিমত তাহার ব্যবস্থাও করিল। ব্যবস্থা—ছাই ! সত্যেন্দ্র তাহার শ্বশুর ও শাশুড়ীর উপর সংসারের-ভার অর্পণ করা ভিন্ন আর কোনও উপায় দেখিল না। হরিহর এখন সত্যেন্দ্রের কৃপাতেই চাকুরীর অন্ন খায়। কাজেই সে ভিন্ন বাটীতে বাস করে। সময়ে অসময়ে টাকাকড়ি সত্যেন্দ্রকে অনেকই দিতে হয়। তথাপি কি ভাবিয়া সত্যেন্দ্র তাহার শ্বশুর শাশুড়ীকে আপন বাটীতে থাকিতে দেয় না—ভিন্ন বাসার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছে, তাহা সত্যেন্দ্রই বলিতে পারে। কিন্তু এখন তাহাদের আপন বাটীতে আনয়ন না করা ভিন্ন সত্যেন্দ্রের আর কোনও উপায়ই রহিল না। শ্বশুর শাশুড়ীকে না আনিলে সত্যেন্দ্রের সংসার চলে কেমন করিয়া ?

হরিহর ও দুর্গাবতী আসিয়া জামাতার সংসার মাথায় করিয়া রাখিল। তাহাতে সত্যেন্দ্রের অনেক খরচ বাড়িল বটে, কিন্তু তাহা না করিয়াই বা আর উপায় কি ?

দুর্গাবতী সংসারের-ভার লইবার পর হইতে সত্যেন্দ্র দুই বেলা পেট-ভরিয়া খাইতে পায়। সত্যেন্দ্র মনে করে, তাহাই তাহার পক্ষে যথেষ্ট। শ্বশুর শাশুড়ীর স্কন্ধে সংসারের বোঝা চাপাইয়া সত্যেন্দ্র এখন নিশ্চিন্তমনে চাকুরী করে আর ছুটীর পর বাড়ীতে আসিয়া মোহিনী অর্দ্ধাঙ্গিনীর সহিত অনুদ্বিগ্ন মনে প্রেমালাপ করিবার অবসর পায়—ইহাই তাহার পক্ষে পরম-লাভ।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

অভয়াসুন্দরী অনেক চেষ্টা করিয়া স্বামীকে বুঝাইবার চেষ্টা করিল যে নীহারিকাকে বিবাহ করিবার জন্য সত্যেন্দ্রের দোষ যতটা হইয়াছে, অবিবাহিত সত্যেন্দ্রকে একাকী রাখিয়া তাহাদের তীর্থ-ভ্রমণে যাওয়াটা তাহার অপেক্ষা চতুর্গুণ হইয়াছে। লোভের জিনিস সম্মুখে থাকিলে সকলেরই লোভ হয়—লোভের মাত্রা সকলেরই বাড়িয়া থাকে। অতএব নীহারিকাকে বিবাহ করিয়া সত্যেন্দ্র আর বিশেষ অপরাধ করিয়াছে কি ?

চিন্তামণি প্রথমে সে কথা বুঝিতে চাহিলেন না। তাঁহার কথা—তাঁহার নিষেধ সত্ত্বেও সতু কেন অ-ঘরে বিবাহ করিল ? আর ছেলে মানুষের এমনই কি লোভ যে লোভের জিনিস দেখিলেই তাহা আত্মসাৎ করিতে হইবে ?

অভয়াসুন্দরী হাসিয়া স্বামীকে বুঝাইয়া দিল যে ছেলে মানুষেরই লোভ অধিক হইয়া থাকে—কারণ তাহারা হিতাহিত জ্ঞানশূন্য। ভবিষ্যৎ ফলাফলের দিকে তাহাদের আদৌ দৃষ্টি নাই। অভয়াসুন্দরী আরও বুঝাইয়া দিল—নীহারিকার সহিত সত্যেন্দ্রের বিবাহে তাহার স্বামীর যদি অমতই ছিল, তাহা হইলে সত্যেন্দ্র-লৌহকে নীহারিকা-চুম্বকের সম্মুখে রাখিয়া তাঁহাদের তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়া বেড়ান কিছুতেই সুবিবেচনার কার্য্য হয় নাই। এরূপস্থলে তাঁহার স্বামীর উচিত ছিল—সত্যেন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া যাওয়া। ভুল-ভ্রান্তিতেই হউক আর অভিমান ভরেই হউক, যখন তিনি তাহা করেন নাই, তখন শুধু সত্যেন্দ্রকেই এ বিষয়ে দোষী করা বা তাহার উপর রাগ করা খুব অন্যায় না হইলেও

খুব ন্যায়সঙ্গত নহে। বালকের দল অনেক সময়েই কাহারও কথা গ্রাহ্য করে না—বরং অবাধ্যতাচরণই করিয়া থাকে। তাই বলিয়া সন্তান কে কোথায় ত্যাগ করে—সন্তানের অপরাধ কে কোথায় ক্ষমা না করিয়া থাকিতে পারে? সতু অপরাধ করিয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া কি সে ক্ষমার পাত্র হইবে না?

আজ "দেশের বড়্দা"—দেশের লোকের চক্ষে, বুদ্ধিতে যিনি বৃহস্পতি, জ্ঞানে রমাপতি, ত্যাগে উমাপতি, প্রতিজ্ঞা-পালনে সীতাপতি, —যাঁহার সারল্যের তুলনা নাই, উদারতার তুলনা নাই, লোক-প্রিয়তার তুলনা নাই, সমবেদনা সহানুভূতির তুলনা নাই—তিনি আজ পত্নীর নিকট বিচারে পরাস্ত হইলেন—পরাজয় স্বীকার করিলেন। সে পরাজয়ে পরাজিতের অনির্ব্বচনীয় আনন্দ। কারণ, উদার-স্বভাব পরাজিত চিন্তা-মণি এখন বুঝিয়াছেন—অভিমান ভরে তিনি কি ভুলই করিয়াছিলেন; আর কি একটা নূতন ভুলই করিতে বসিয়াছিলেন।

তরুলতার শাশুড়ীর মতেই মত। তরুলতাও পীতাম্বরকে কহিল—

"তোমরা সতুর দোষ দাও কি—দোষ তোমাদের নিজের। তুমি দেশে ব'সে রইলে অথচ বুঝ্লেও না, দেখ্লেও না সতু কি ছিল, আর কি হ'য়ে গেল। তুমি যদি তা'র খোঁজ-খবর নিয়ে বাবাকে চিঠি লিখ্তে, তা' হ'লে বাবা তখনই চ'লে এসে যা' হয় একটা ব্যবস্থা কর্তে পা'রতেন। তা'ত তুমি কর্তে পারলেও না—আর ক'র্তে দিলেও না—তবে এখন আর সতুকে দোষ দেওয়া কেন?"

অপ্রতিভ পীতাম্বর এ "কেন"র উত্তর দিতে পারিল না। তবু তরুলতা শুনে নাই যে তাহারা তীর্থ-ভ্রমণের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিবার পর সতুর সহিত তাহার স্বামী—অযথা কলহ বিবাদ করিয়াছিল এবং তাহাকে লাঞ্ছিত ও অবমানিত করিতেও বাকী রাখে নাই।

পীতাম্বরের মনটা খারাপ হইয়া গেল। সে ভাবিতে লাগিল—সত্যেন্দ্রের উপর তাহাদের বাটীর সকলেরই অতটা টান কেন? যাহার জন্য যাহাকে ভৎ র্সিত হইতে হয়, তাহার উপর তাহার স্বভাবতই ক্রোধের সঞ্চার হইয়া থাকে। পীতাম্বরের ক্রোধের মাত্রা খুবই বাড়িল—তবে তাহা হৃদয়ের নিভৃত কন্দরে। সে ক্রোধ ফুটিতে পাইল না। তরুলতা সুকঠিন রোগের কবল হইতে কোনও প্রকারে পলাইয়া আসিবার পর হইতে পীতাম্বর তাহার স্ত্রীর কথায় বা স্ত্রীর সম্মুখে সত্যেন্দ্র সম্বন্ধে কোনও প্রকার অপ্রিয় কথা আর বলিত না এবং তাহার প্রতি ক্রোধও প্রকাশ করিত না।

পীতাম্বরের জ্বালার উপর জ্বালা বাড়িল। চিন্তামণি, পুত্রকে ডাকিয়া আদেশ করিলেন—

"দেখ, পীতু, সতুর খবরটা তোমাকেই একবার নিতে হ'বে। সে যা' করেছে—তা' করেছে। তা'কে বলিস্ বাবা, তা'র দোষের জন্য তা'কে আর কোনও সাজা দেব না। সে দেশে ফিরে বসবাস করুক্—আমি তা'কে এতটুকুও বক্‌ব না। বুঝ্‌লি রে?"

পীতাম্বর ছাই ভস্ম বুঝিয়াছিল। তথাপি তাহাকে বলিতে হইল—সে সমস্তই বুঝিয়াছে। পিতার আদেশের বিরুদ্ধে "না" বলিতে পীতাম্বর এখনও সাহস করে না।

সত্যেন্দ্র প্রভৃতিকে দেশে ফিরাইয়া আনিবার জন্য পীতাম্বরকে আর কলিকাতায় যাত্রা করিতে হইল না। চিন্তামণি লোক-পরম্পরায় শুনিলেন যে সত্যেন্দ্র এখন অতল জলে তলাইয়া গিয়াছে। তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া আর সম্ভবপর হইবে না। চিন্তামণি তখন ভাবিতে লাগিলেন—এরূপস্থলে কিরূপ করা কর্ত্তব্য।

———০———

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

হরিহর এখন সত্যেন্দ্রের সংসারের কর্ত্তা। কিন্তু সে কর্ত্তৃত্বটা দুর্গাবতীর আদৌ ভাল লাগে না। দুর্গাবতী বলে—ঝি জামায়ের সংসারে একে ত থাকিতেই নাই; দায়ে পড়িয়া যদি থাকিতেই হয়, তবে সে সংসারের কর্ত্তৃত্ব-ভার স্কন্ধে লওয়া একান্ত অশোভন।

হরিহর কিন্তু স্ত্রীর কথায় কর্ণপাত করিতে চাহে না। সত্যেন্দ্রের অর্থ খরচ করানতে তাহার বিলক্ষণ লাভ আছে। নির্ব্বোধ সত্যেন্দ্রের খরচ যত অধিক হয়, হরিহরের ভাণ্ডার তত পূর্ণ হয়। জামাতার সংসারে কর্ত্তা হইয়া হরিহর বেশ দুই পয়সার সংস্থান করিবার সুযোগ পাইয়াছে। এরূপস্থলে বুদ্ধিহীনা স্ত্রীর কথায় হরিহর কর্ণপাত করিতে যাইবে কেন? হরিহর বহু গবেষণায় স্থির করিয়াছে—জামাতার অর্থ শ্বশুরের ভাণ্ডারজাত হইতেছে, তাহাতে বিশেষ আর ক্ষতি কি!

জামাতার সংসার দেখা ভিন্ন জামাতার কর্ম্মস্থলেও হরিহরকে কর্ত্তৃত্ব করিতে হয়। জামাতার কৃপাতেই হরিহর সে স্থানে সামান্য বেতনের একটা চাকুরী পাইয়াছিল। কিন্তু সত্যেন্দ্রের শ্বশুর বলিয়া চাকুরী-স্থলে তাহার অনেকটা মর্য্যাদা বাড়িয়াছিল। মূর্খ হরিহর জমীদারী সেরেস্তার কাজকর্ম্ম অবশ্য কিছুই বুঝিত না। সে বুঝিত ও জানিত কেবল প্রজাবৃন্দ ও আমলাবর্গকে উৎপীড়িত করিতে। সে উৎপীড়নে তাহার বিলক্ষণ লাভ ছিল। উৎপীড়িত হইয়া লোকে তাহাকে উৎকোচ দিত। তাহাতেও হরিহরের সঞ্চয়ের পথ বিলক্ষণ প্রশস্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

কিন্তু তাহাতে সত্যেন্দ্রের উপর লোকের আস্থা কমিয়া যাইতেছিল।

শ্বশুরের ভাণ্ডার যত পূর্ণ হইতে লাগিল, জামাতার কলঙ্ক তত অধিক বাড়িতে লাগিল। হরিহরকে দারুণ ঘৃণা করিলেও সত্যেন্দ্রের ভয়ে লোকে তাহাকে কিছু বলিত না বটে; কিন্তু মনে মনে সকলেই শ্বশুর ও জামাতার মৃত্যুকামনা করিত।

সত্যেন্দ্র বিশেষ কাজের লোক বলিয়া সত্যেন্দ্রের প্রভু তাহার উপর বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলেন। সেই কারণেই এতদিন পর্য্যন্ত লোকে তাহার কোনও অনিষ্ট করিতে পারে নাই। কিন্তু সুচতুর আমলাবর্গ কবে শ্বশুর জামাতার উচ্ছেদসাধন করিবার অবসর পাইবে, সেই শুভদিনের প্রতীক্ষায় হরিহরের সকল অত্যাচারই নীরবে সহ্য করিতেছিল। সত্যেন্দ্র যে তাহা না বুঝিত, এমন নহে। কিন্তু বুঝিয়াই বা সে কি করিতে পারে? শ্বশুরকে ত সে কোনও কথা বলিতে পারে না— সত্যেন্দ্রের ভারী লজ্জা, ভারী শ্বশুর-প্রীতি।

পুত্রের জনক হইয়া সত্যেন্দ্রের সে প্রীতি অধিকতর বর্দ্ধিত হইয়াছিল। সন্তানবাৎসল্যের তাড়নায় ও সন্তানের মাতার অলৌকিক রূপ-সুধা পান করিবার উৎপাতে যথাসময়ে কর্ম্মস্থলে যাওয়া সত্যেন্দ্রের পক্ষে এখন কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সত্যেন্দ্র মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছিল, চাকুরী তাহাকে ত্যাগ করিতেই হইবে। চাকুরী রাখিতে হইলে তাহার আর স্ত্রীর পুত্র দেখা হয় না।

কিন্তু চাকুরী ছাড়িয়া দিলেই বা তাহার চলিবে কেমন করিয়া? সে যেরূপ বিলাসী, সংসারে তাহার যেরূপ খরচ, তাহাতে কেবল মাত্র তাহার ক্ষুদ্র তালুকখানির আয়ের উপর নির্ভর করিলে আর চলে না। বিলাসিতার স্রোতে ভাসিয়া ও শ্বশুরের আত্মীয়তায় উৎপীড়িত হইয়া ইতিমধ্যেই সত্যেন্দ্রকে কিছু ঋণ করিতে হইয়াছিল। অতএব অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়াও সত্যেন্দ্র স্থির করিতে পারিল না—চাকুরীটা ছাড়া তাহার পক্ষে

উচিত কিনা। অথচ চাকুরী তাহাকে ছাড়িতেই হইবে—নতুবা স্ত্রী-পুত্রের মুখচন্দ্র নিরবধি নিরীক্ষণ করা তাহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না।

কথাটা সমস্যার বটে! কিন্তু এ সমস্যা মিটিবার নহে। কারণ, সত্যেন্দ্রের বয়স অল্প, অভিজ্ঞতা অল্প, আয় অল্প—তাহার উপর স্ত্রীর রূপে সে আত্মহারা। বিলাসী সত্যেন্দ্রের সমস্যা মিটিতে পারে কিরূপে? সমস্যা তাহার ভাগ্যে বরং বাড়িয়া উঠিল। "বড়্দা'র" নিকট হইতে সেই সময়ে আদেশ আসিয়াছে, চাকুরী ছাড়িয়া তাহাকে দেশে ফিরিতে হইবে—কলিকাতায় থাকিবার তাহার কোনও আবশ্যকই নাই।

আদেশ শুনিয়া সত্যেন্দ্রের চক্ষু কপালে উঠিল। যে "বড়্দা'র" নিকটে সে সহস্র প্রকারে ঋণী, এবং শত প্রকারে অপরাধী, তাঁহার আদেশ সে অগ্রাহ্যই বা করে কি সাহসে; আর শিরোধার্য্যই বা করে কেমন করিয়া? দেশের আব্হাওয়া যে সত্যেন্দ্রের আর ভাল লাগিবে না, সত্যেন্দ্র সে কথা পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিল। কিন্তু সে কথা ত সে "বড়দা'র" নিকট মুখ ফুটিয়া বলিতে পারে না।

হরিহর আসিয়া সত্যেন্দ্রের সে সমস্যার মীমাংসা করিয়া দিল। হরিহর কহিল—

"এখন যাওয়া হ'বে কেমন ক'রে—এই হ'ল কিস্তির সময়।"

কিস্তি মাৎ হইয়া গেল। হরিহরের পরামর্শে সত্যেন্দ্র "বড়দা'র" লোককে ফিরাইয়া দিল। "বড়দা"—তাঁহার প্রেরিত লোককে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া ও লোকের মুখে সকল কথা শুনিয়া ভাবিলেন—পীতাম্বরকে সত্যেন্দ্রের নিকট না পাঠাইয়া তিনি ভালই করিয়াছেন। পীতাম্বর সেখানে যাইলে এ সকল কথাবার্ত্তার পর সত্যেন্দ্র ও পীতাম্বরের মধ্যে নিশ্চয়ই একটা কলহ বিবাদ হইত—সেটা একেবারেই বাঞ্ছনীয় নহে।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

পিতার অত্যাচার দেখিয়া নীহারিকার লজ্জা ও ক্রোধ দুইই হইয়াছিল। সংসারের খরচ সত্যেন্দ্রের খুবই বাড়িয়াছিল। যে খরচ একজন ধনীর সংসারে হইলে শোভন হয়, সত্যেন্দ্রের খরচ এখন প্রায় সেইরূপ। তাহার উপর হরিহরের ভৎ'সনা আছে, ভয়প্রদর্শন আছে, মুরব্বীয়ানার উপদ্রব আছে—লোকজনের উপর গালিবর্ষণের ঘটা আছে, সত্যেন্দ্রের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিগণের উপরও তীব্র মন্তব্যপ্রকাশ করার উৎকট আকাঙ্ক্ষা আছে। সম্পর্কের খাতিরে সত্যেন্দ্র এখনও পর্যান্ত শ্বশুরের মুখের উপর কোনও কথা কহে না। কিন্তু মনে মনে সে কি ইহাতে বিরক্ত হয় না?

নীহারিকা তাহার স্বামীর মনের কথা বুঝিতে পারিল এবং তাহা বুঝিতে পারিয়া পিতার উপর সে বিশেষ অসন্তুষ্ট হইল। কিন্তু মুখ ফুটিয়া তাহার ত কোনও কথা প্রকাশ করিবার উপায় নাই। সংসারের কাজকর্ম্ম সে কিছুই শিখে নাই—কিছুই জানে না। এরূপস্থলে সে যদি পিতার কথার উপর কথা কহে, পিতার কার্য্যের সমালোচনা করে, তাহা হইলে তাহার সংসারে একটা বিশেষ গোলযোগ বাধিবারই সম্ভাবনা। সে গোল বাধিলে তাহার স্বামীর আহারাদির কষ্টও যে না হইবে, সংসারে আবার বিশৃঙ্খলাও যে না আসিবে, তাহারই বা নিশ্চয়তা কি? সেই আশঙ্কায় স্বামী-সোহাগিনী নীহারিকা তাহার পিতার অত্যাচারের বিরুদ্ধে কোনও কথাই কহিতে সাহস করিল না—সেরূপ করাও যে খুব সঙ্গত নহে—তাহাও নীহারিকা স্থির করিয়া লইল।

কাজকর্ম্ম সে আদৌ করিতে পারে না, সংসার চালাইবার বিধি ব্যবস্থা করিবার শক্তি তাহার আদৌ নাই। সকল বিষয়েই তাহাকে পরের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিতে হয়। সুতরাং সহ্য না করিয়া তাহার আর উপায় কি?

কিন্তু সকল জিনিসেরই একটা সীমা আছে। সে সীমা—সে গণ্ডী পার হইতেই, নীহারিকার মুখ ফুটিয়া উঠিল। নীহারিকা তখন তাহার মাতা দুর্গাবতীকে কহিল—

"মা, আমার সংসারটা কি তুমি থাক্‌তে গোল্লায় যা'বে?"

হরিহরের ব্যবহার দেখিয়া দুর্গাবতীও তাহার স্বামীর উপর বিশেষ চটিয়াছিল। দুর্গাবতী বলিল—

"ওসব কথা আমায় বলিস্ নে মা। আমি তোদের কিসে আছি—বল্?"

কন্যা, জননীর মনের ভাব বুঝিতে পারিল না। কথাটার অন্যার্থ করিয়া নীহারিকা কহিল—

"তুমি রাগ কর'ছ কেন মা? টাকা যদি এমন করে নষ্ট হয়, তা' হ'লে তোমাদের মেয়ে জামাই ত কষ্ট পাবে।"

হরিহর পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে অবস্থান করিতেছিল। কন্যার কথা শুনিয়া পিতার ক্রোধের আর সীমা রহিল না,—হরিহর আপন কন্যাকে অনেক কটুকথা বলিল, অনেক ভয় দেখাইল, অনেক অভিশাপ দিল। কন্যা-জামাতার মুখ চাহিয়াই যে হরিহর সস্ত্রীক সেস্থানে আছে, সে কথা কন্যাকে বুঝাইতে তাহার কোনও ত্রুটী হইল না। কন্যা-জামাতার সুখের জন্যই যে হরিহরকে নানা ক্ষতি সহ্য করিতে হইয়াছে, ভোগৈশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া পথের ভিখারী হইতে হইয়াছে, সে কথাও কন্যাকে বুঝাইবার সে অনেক চেষ্টা করিল। কন্যা সে কথা বুঝিল

কি না বলিতে পারা যায় না—তবে পিতার কথায় সে আর কোনও কথাই কহিল না।

নীহারিকা কোনও কথা না কহিলেও দুর্গাবতী কিন্তু স্বামীকে অনেক কথা শুনাইয়া দিল। কথার উত্তর প্রত্যুত্তরে অনেক কথা বাড়িয়া গেল। কথা বাড়িলেই তাহা কলহে পরিণত হয়। হরিহরের সহিত দুর্গাবতীর কলহ হইয়া গেল।

সত্যেন্দ্র কর্ম্মস্থল হইতে বাটীতে আসিয়া যখন সকল কথা শুনিল, নীহারিকাকেই সে সকল দোষের জন্য দায়ী করিল। দুর্গাবতী তখন জামাতাকে বুঝাইতে লাগিল যে সে ব্যাপারে নীহারিকার কোনও অপরাধই নাই, আর তিরস্কৃতা হইয়াও সে কাহারও কথার উপর কথা কহে নাই। দোষ যদি কাহারও থাকে, তবে তাহা সত্যেন্দ্রের শ্বশুরের।

এই সকল কথাবার্ত্তা শুনিয়া হরিহর অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। সত্যেন্দ্র, শ্বশুরকে শান্ত করিবার অনেক চেষ্টা করিল,—কিন্তু হরিহর কিছুতেই শান্ত হইল না। সেই রাত্রেই হরিহর "পোঁট্‌লা পুঁট্‌লি" লইয়া যে কোথায় চলিয়া গেল, সে সন্ধানও কেহ করিতে পারিল না। যাইবার সময় হরিহর কেবলমাত্র বলিয়া গেল—জামাতার অন্ন বিষ্ঠা স্বরূপ—তাহাতে তাহার আর বড় রুচি নাই।

দুর্গাবতীও হরিহরের সঙ্গে যাইতে চাহিয়াছিল। কিন্তু ক্রোধবশতঃ হরিহর স্বীয় পত্নীকে সঙ্গে লয় নাই।

হরিহরকে বাটী ফিরাইবার জন্য বাটীর সকলেই যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু পুরুষের লক্ষণ যে রাগ, তাহা হরিহরের যথেষ্টই ছিল। সুতরাং সে কি তখন আর ফিরিয়া আসে?

———

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

চিন্তামণির প্রেরিত লোক কলিকাতা হইতে ফিরিয়া যাইয়া সত্যেন্দ্রের সম্বন্ধে চিন্তামণির নিকট যাহা বলিয়াছিল, তাহা গল্প-কথার মত অতিরঞ্জিত না হইলেও নির্ম্মল সত্য নহে। লোকটা, সত্যেন্দ্রের চরিত্রে বড় অধিক দোষারোপ করে নাই। কিন্তু হরিহর যে মূর্ত্তিমান মহাপাপ, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য সে অনেক অযথা কথাও বলিয়াছিল। তাহার এরূপ অযথা কথা বলিবার একটু কারণ আছে। হরিহরের কথাবার্ত্তা, আচার ব্যবহার তাহার আসলে ভাল লাগে নাই।

কলিকাতা হইতে প্রত্যাগত লোকের মুখে সকল কথা অবগত হইয়া চিন্তামণি বিস্মিত হইলেন। মানুষ যে এমন করিতে পারে, মানুষ যে এমন হইতে পারে, চিন্তামণি, এতদিন সে কথা বিশ্বাস করিতে পারিতেন না। কিন্তু হরিহরের কার্য্যকলাপের কথা শুনিয়া তাঁহার অনেকটা চক্ষু ফুটিল। চিন্তামণি ভাবিলেন—আর কাহাকেও ভালবাসা হইবে না। ভালবাসায় ভারী বিপদ—ভারী জঞ্জাল! ভাল কাহাকেও বাসিতে নাই—ভাল বাসিলেই অত্যাচার সহ্য করিতে হয়।

চিন্তামণি, দেশশুদ্ধ লোককে ভালবাসিয়া ভালবাসাই পাইয়াছিলেন। ভালাবাসার পরিবর্ত্তে ঘৃণা, ঔদাসীন্য, বা শত্রুতা তিনি কাহারও নিকট হইতে কখনও পান পাই। উপস্থিত ক্ষেত্রে সেরূপ ঘৃণা বা শত্রুতার পরিচয় পাইয়া "দেশের বড়দা" হইলেও চিন্তামণির মন "বিগড়াইয়া" গেল। মানুষ—মানুষ; মানুষ দেবতা নহে। সুতরাং চিন্তামণিকেই বা দোষ দেওয়া যায় কি প্রকারে?

তবে চিন্তামণির উচিত ছিল—সত্যেন্দ্র ও হরিহরের কথা সম্বন্ধে "পরের মুখে ঝাল না খাওয়া।" যে তাঁহার একদিন অত্যন্ত ভালবাসার পাত্র ছিল, যাহার সুখ স্বস্তির জন্য তিনি একদিন তাঁহার নিজপুত্রকেও অভিমানভরে ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, যাহার "বড়্‌দা" ভিন্ন এ সংসারে আর কোনও হিতাকাঙ্ক্ষী নাই, যাহার মুমূর্ষু পিতা তাহাকে "বড়্‌দ"ার হস্তে তুলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত মনে সংসারের পরপারে চলিয়া-গিয়াছেন; সেই "বড়্‌দা"র উচিত হয় নাই—পরের কথায় কাণ ভারী করিয়া সত্যেন্দ্রকে তাঁহার স্নেহ-নীড়্‌ হইতে বঞ্চিত করা; সত্যেন্দ্রের সহিত সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হওয়া।

সত্যেন্দ্র যে সহস্র অপরাধে অপরাধী—সে কথা সহস্রবার বলা যাইতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া কি তাহার সে অপরাধের ক্ষমা ছিল না? শাসনের ছলে "বড়্‌দা" সত্যেন্দ্রকে একবার ডাকাইলেন না কেন? শাসনের উদ্দেশ্যে তিনি একবার হরিহরকে চ'খ রাঙ্গাইলেন না কেন? তাহা হইলেই ত সকল গোল মিটিয়া যাইত। ভালবাসার বস্তুর মঙ্গল সাধন করিতে হইলে মানুষকে অনেক হীনতাই সহ্য করিতে হয়। কিন্তু দেবতুল্য "বড়্‌দা"ও অভিমানের অন্যায় আব্‌দারে তাহা করিয়া উঠিতে পারিলেন না। তাহার ফলে সত্যেন্দ্রের সর্ব্বনাশ হইয়া গেল—সে দায়ীত্ব কে গ্রহণ করে?

অভয়াসুন্দরী গলবস্ত্রে স্বামীর নিকট অনেক কথাই নিবেদন করিল, সত্যেন্দ্রের প্রতি প্রসন্ন হইবার জন্য অনেক অনুনয়, অনুরোধই করিতে লাগিল। কিন্তু অভিমান-রুষ্ট চিন্তামণি দৃঢ়তার সহিত তাহা উপেক্ষা করিয়া কহিলেন—

"সত্যেন্দ্রের ক্ষমা আর আমার কাছে নাই। যে স্ত্রী চিনেছে, শ্বশুর চিনেছে—তা'র সঙ্গে এখন আর আমার সম্পর্ক কি?"

অভয়াসুন্দরী বলিলেন—

"এ কথা বলা তোমার সাজে না। দিনে দিনে তুমি হচ্ছ কি ?"

"পাগল—আর কিছু ব'ল্‌তে চাও ?"

"তোমায় আমি আর কি বুঝা'ব বল ? তবে এইটুকু বল্‌তে পারি যে রাগটা যদি তুমি একটু সাম্‌লা'তে পার্‌তে, তা' হ'লে হয়ত তোমাকে বোঝালেও বোঝা'তে পা'রতেম্‌। সতু তোমারই···"

"সে একদিন ছিল—আজ আর তা' নেই।"

"চিরদিনই তাই আছে—আর চিরদিনই তাই থাকবে। তবে ছেলে-বুদ্ধিতে সে কতকগুলো অন্যায় কাজ ক'রে ফেলেছে : তাই ভয়ে, লজ্জায় সে আর তোমার কাছে আস্‌তে সাহস কর্‌ছে না। এই হ'ল আসল্‌ কথা। তুমি তা' না বুঝ্‌লে আমি আর কি কর্‌ব বল ?"

"কা'কেও কিছু ক'র্‌তে হ'বে না। আমায় নির্জ্জনে থাকতে দাও—এই আমার অনুরোধ। তুমি বুঝ্‌তে পারবে না গো, বুঝ্‌তে পার্‌বে না—আমার প্রাণের কি জ্বালা! সে আমার বড় আদরের—বড় সোহাগের। তা'কে যে আমি আজ ত্যাগ কর্‌ছি, সে কি সামান্য কারণে গা ? যাও, কোনও কৈফিয়ৎ আমি দিতে চাই না। আমায় এখন একটু নিরিবিলিতে থাক্‌তে দাও।"

অভয়াসুন্দরী, স্বামীর স্বভাব বিলক্ষণই জানিতেন। তাঁহার নিকট আপাততঃ যে ক্ষমার কোনও আশাই নাই, তাহা বুঝিয়া অভয়াসুন্দরী স্থান ত্যাগ করিলেন।

কিন্তু তাহাতেও চিন্তামণির নির্জ্জনে থাকা ঘটিয়া উঠিল না। পীতাম্বর আসিয়া পিতাকে অনুরোধ করিল—সতুকে এ যাত্রা ক্ষমা করিতে হইবে। পীতাম্বর কহিল—

"সত্যেন্দ্র ছেলে মানুষ ; সে কি কর্‌তে কি করেছে, কি বল্‌তে কি

বলেছে, তা' ধর্‌তে গেলে তা'কে আর ক্ষমা করা চলে না। যে আপ-নার অন্নে প্রতিপালিত, আপনার দয়ায় এখন পাঁচজনের একজন, তা'র হাজার দোষ আপনাকে ক্ষমা কর্‌তে হ'বে বৈকি ?"

পিতা, পুত্রের কথা অবাক হইয়া শুনিতে লাগিলেন। পীতাম্বর যে দুই চক্ষে সত্যেন্দ্রকে দেখিতে পারিত না—সুবিধা পাইলে পীতাম্বর যে সত্যেন্দ্রের শত্রুতা করিত, এইরূপই চিন্তামণির ধারণা ছিল। সেই পীতাম্বর যখন তাঁহার নিকট সত্যেন্দ্রের পক্ষাবলম্বন করিয়া ওকালতী করিতে আরম্ভ করিল, তখন তাঁহার অবাক ত হইবারই কথা।

চিন্তামণির এই ওকালতীতে তরুলতার যে বিশেষ হাত্ ছিল, তাহা অবশ্য চিন্তামণি তখনও বুঝিতে পারেন নাই। অনেক চক্ষের জল ফেলিয়া, অনেক ভয় দেখাইয়া, অনেক পায়ে ধরিয়া তবে তরুলতা তাহার স্বামীকে এ কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইতে সমর্থ হইয়াছে। ইহাতে অভয়াসুন্দরীরও যে কিছু হাত্ ছিল না, সে কথাই বা কে বলিতে পারে ?

সে যাহা হউক, পুত্রের সকল কথা শুনিয়া চিন্তামণি বিস্ময়-স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। অভয়াসুন্দরী ফিরিয়া আসিয়া সতুকে ক্ষমা করিবার জন্য যখন স্বামীকে আবার অনুরোধ করিলেন, তখন চিন্তামণি কহিলেন—

"আচ্ছা ভেবে দে'খব, কি করা যেতে পারে।"

অভয়াসুন্দরী এইবার নিশ্চিন্ত হইলেন। পাকা গৃহিণীর তখন আর বুঝিতে বাকী রহিল না যে কর্ত্তার মনটা তখন অনেকটা নরম হইয়া গিয়াছে। মানুষের মন নরম হইলে তাঁহার নিকট ক্ষমা সুদুর্লভ কি ?

———•———

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

হরিহর চলিয়া যাইবার পর সত্যেন্দ্রের সংসার বিশৃঙ্খল হয় নাই, বরং দুর্গাবতীর যত্ন ও চেষ্টায় তাহা সুশৃঙ্খলভাবেই চলিতেছিল। নীহারিকাও এখন প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া সংসারের অনেক কাজ শিখিয়াছে এবং অনেক কাজই করিতে পারে। প্রাণের দায় বড় দায়! সে দায়ে ঠেকিলে অনেককেই অনেক জিনিস করিতে হয়—অনেক জিনিস শিখিতে হয়। সংসার বড় কঠিন স্থান!

অল্পখরচে সত্যেন্দ্রের সংসার এখন সুচারুরূপেই চলিতেছিল। সে সংসারে অশান্তির কুজ্ঝটিকা এখন আর তেমন নাই। এখন যাহা কিছু অশান্তি, যাহা কিছু মর্ম্মবেদনা তাহা মাত্র হরিহরের জন্য। সত্যেন্দ্র সর্ব্বদাই চিন্তা করে, শ্বশুর মহাশয় অযথা কলহ বিবাদ করিয়া তাহাদের ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইলেন কেন? নীহারিকাও তাহার পিতার জন্য চিন্তিতা ও মর্ম্মাহতা। দুর্গাবতীর দুঃখই সমধিক। তবে সে তাহার স্বামীকে চিনিত। বিনা কারণে যে হরিহর সহসা জামাতার গৃহত্যাগ করিল, এমন কথা দুর্গাবতী কিছুতেই মনে স্থান দিতে পারিল না। দুর্গাবতী স্থির করিল—তাহার স্বামী যেমন চিরদিন করিয়া থাকে, সম্ভবতঃ এবারও সেইরূপ করিয়াছে। জামাতার নিকট হইতে তাহার স্বামী যে এবার কিছু মোটা টাকা অভিমানের মূল্যস্বরূপ দাবী করিবে, ইহা দুর্গাবতীর প্রতীতি হইয়াছিল। সুতরাং স্বামীর অদর্শন জন্য তাহার মনে দারুণ কষ্ট হইলেও দুর্গাবতীর মনে মনে ধারণা ছিল যে হরিহর কোনও নিরাপদ স্থানে নিরাপদে আছে।

বস্তুতঃ দুর্গাবতী যাহা ভাবিয়াছিল, তাহাই সত্য। হরিহর এখন কাশীধামে কোনও এক বন্ধুগৃহে বসবাস করিতেছে। অবিলম্বে প্রত্যাগমনের সম্ভাবনা না থাকিলেও দূর ভবিষ্যতে যে হরিহর আবার কন্যা জামাতার সহিত সাক্ষাৎ করিবে, এমন কথা একদিন হরিহরের পত্রেই জানিতে পারা গেল। নিরুদ্দিষ্টের উদ্দেশ পাইয়া সত্যেন্দ্র প্রভৃতি সকলেই একটু নিশ্চিন্ত হইবার অবকাশ পাইল। লোকে নিশ্চিন্ত হইলেই লোকের সংসারে শান্তি-সুখ বৃদ্ধি পায়। সত্যেন্দ্রের সংসারেও শান্তি-সুখ এখন যথেষ্ট।

নীহারিকা, জননীর সহায়তায় সংসার মাথায় করিয়াও স্বামীসেবা করিবার এখন যথেষ্ট সময় পায়। অনুরাগিণী পত্নীর আন্তরিক সেবায় ধন্য হইয়া সত্যেন্দ্র ভাবিতে লাগিল—নীহারিকার মত যাঁহার স্ত্রী আছে, সংসারে তাহার আবার অভাব কিসের?

প্রেমস্নিগ্ধ সত্যেন্দ্র একদিন নীহারিকাকে বুকের কাছে টানিয়া জিজ্ঞাসা করিল—

"আচ্ছা নীরু, তুমি ত চিরদিনই আমায় ভালবাস?"

স্বামীর নিকট হইতে এরূপ প্রশ্ন নীহারিকা সে সময়ে আশা করে নাই। সে নীরবে স্বামীর মুখের দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

হরিণ-নয়না নীহারিকার সে উজ্জ্বল চক্ষু দেখিয়া সত্যেন্দ্র আর আপনাকে সংযত রাখিতে পারিল না। প্রগাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া পতি, পত্নীর মুখচুম্বন করিল। সে ঋণ নীহারিকা শোধ করিতে বাকী রাখিল না—সুদ সমেত সে তাহা ফিরাইয়া দিল। তখন যুবক যুবতীর কি বিপুল আনন্দ!

সত্যেন্দ্র, নীহারিকার কবরীবন্ধন খুলিয়া দিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল—

"আচ্ছা, ছেলেবেলা থেকেই ত তুমি আমার 'অনুরাগিণী ; আর আমিও তোমার অনুরাগী। তখন তুমিও বুদ্ধিমতী ছিলে, আর আমিও বুদ্ধিমান না হ'লেও খুব বোকা ছিলেম না। মাঝখানটায় তুমিই বা এমন বোকা হ'য়ে গেলে আর আমিই বা এমন জড়-ভরত হ'য়ে গেলেম কেন বল দেখি ?"

নীহারিকা এতক্ষণে স্বামীর প্রথম প্রশ্নের অভিপ্রায়টা বুঝিতে পারিল। সে কহিল—

"দেখ, আমিও তাই ভাবি—কেন এমনটা হ'য়ে গেল। বিয়ের পর সংসার করতে এসে যদি গোড়া থেকেই বুদ্ধি ক'রে সংসার চালা'তে পারতুম, তা' হ'লে বোধ হয় আমাদের কোনও দুঃখ কষ্টেরই কারণ থাকত না। কিন্তু গরীবের ঘর থেকে একেবারে বড় মানুষের ঘরে এসে আমার যে কেমন ধাঁধা লেগে গেল, আমি যে কেমন বিলাসিতার স্রোতে গা ভাসালুম্, তা'তেই সব গোল হ'য়ে গেল। আমাদের আরও গোল বেধেছে—বড়্দা'র আশ্রয় ছেড়ে। ইচ্ছে ক'রে সেটা থেকে বঞ্চিত হওয়া আমাদের পক্ষে ভাল হয় নি। তুমি নিজে যাও তাঁ'র কাছে। তাঁ'র পায়ে ধ'রে তাঁ'র ক্ষমা চেয়ে এস। আমাকেও না হয় সঙ্গে নিয়ে চল। আমায় সঙ্গে নিলে তোমার লাভ ছাড়া ক্ষতি হ'বে না।"

নীহারিকার কোনও কথা তখন আর সত্যেন্দ্রের কাণে যাইতেছিল না। বড়্দা'র নামটা শ্রবণ-বিবরে পশিতেই তাহার বহুকালাবদ্ধ হৃদয়-কবাট খুলিয়া গেল। সত্যেন্দ্র তখন দেখিল—স্তুপীকৃত অতীতের স্মৃতিতে সে হৃদয় পরিপূর্ণ। অনন্যমন হইয়া সত্যেন্দ্র সেই স্মৃতিগুলির পূর্ব্বরূপ ধ্যান করিতে লাগিল। নীহারিকা তাহাকে ডাকিয়া তাহার আর সাড়া পাইল না। যখন সত্যেন্দ্রের ধ্যানভঙ্গ হইল, তখন নীহারিকা নিদ্রিতা। নিদ্রিতা পত্নীর অধরে সত্যেন্দ্র অধর রাখিতেই

নীহারিকার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। নীহারিকা তখন স্বামীর গলা ধরিয়া অতি কোমলকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—

"ঘুমোও নি ?"

"না। আমি তোমার উপদেশই মেনে নিলেম্। বড়্দা'র কাছে আবার আমি ফিরে যা'ব—তুমিও যা'বে। আমরা তাঁ'র পায়ের উপর পড়্লে তিনি কি আর আমাদের ক্ষমা কর্বেন না ?"

"নিশ্চয় কর্বেন—তা'র আর সন্দেহ কি ? তিনি না করেন, জেঠাই মায়ের পায়ে প'ড়ব। তাঁ'র অনুরোধ বড়্দা' কিছুতেই ঠেল্তে পার্বেন না। এখন তুমি ঘুমোও—কাল সকালে সে সব যুক্তি করা যা'বে।"

দুই জনেই তখন ঘুমাইয়া পড়িল। প্রত্যূষে যখন একটা দুঃস্বপ্ন দেখিয়া সত্যেন্দ্র জাগিয়া উঠিল, তখন তাহার প্রভু-গৃহ হইতে একজন দ্বারবান আসিয়া তাহাকে ভারী ডাকাডাকি করিতেছে। হস্তমুখাদি প্রক্ষালন করিয়া সত্যেন্দ্র তাড়াতাড়ি প্রভু-গৃহে চলিয়া গেল। নীহারিকার ভাবনা হইল—এত প্রত্যূষে প্রভুর আহ্বান কেন—এমন আহ্বান ত কখনও হয় না !

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সত্যেন্দ্রের প্রভু নিখিলশিব রায় খুব সরল, অমায়িক প্রকৃতির লোক। তিনি যে অতটা ঐশ্বর্য্যের অধিপতি, তাঁহাকে দেখিয়া তাহা মনে করা যাইতে পারিত না। তাঁহার বিস্তৃত জমীদারির আয় বিপুল। কিন্তু তিনি যেভাবে দিনপাত করিতেন, একজন সামান্য গৃহস্থও সেরূপ দীনভাবে দিনাতিপাত করিতে লজ্জাবোধ করিয়া থাকে। তাঁহার এ দীনতা দেখিয়া কেহ বলিত—লোকটা ভারী কৃপণ; কাহারও কাহারও অভিমত—সে দীনতা সত্বগুণের বিকাশ। নিখিলশিবের পুত্র অনন্তশিব কিন্তু সে প্রকৃতির লোক নহে। অনন্তশিব মূর্খ, দাম্ভিক, পরশ্রীকাতর, আর বিলাসের দাস। আপনার চক্ষে সে কিছুই দেখিত না—দেখিত পরের চক্ষে; আপনার কর্ণে সে শুনিত না কিছুই, শুনিত পরের কর্ণে। প্রকৃতি যাহার এরূপ, সে অতিশয় ভীষণ ব্যক্তিই হইয়া থাকে। অনন্তশিব ভীষণ ব্যক্তি ছিল। তাহার রুক্ষ স্বভাবের জন্য তাহার পিতাকেও তাহাকে ভয় করিয়া চলিতে হইত। ধীর, শান্ত, ধর্ম্মপ্রাণ পিতাকে অনেক সময়ে অবাধ্যপুত্রকেও ভয় করিয়া চলিতে হয়। নিখিলশিবের অবস্থাও সেইরূপ।

সত্যেন্দ্রের কর্ম্মস্থলে হরিহরের যাহারা শত্রু ছিল, তাহারা নিখিলশিবের নিকট, হরিহর ও সত্যেন্দ্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিবার সুযোগ না পাইয়া অনন্তশিবের আশ্রয় গ্রহণ করা ভিন্ন আর উপায় দেখিল না। অনন্তশিবকে তাহারা বুঝাইয়া দিল যে কর্ত্তার অমনোযোগীতায় ও প্রশ্রয়দানের ফলে সত্যেন্দ্রের সহিত পরামর্শ করিয়া জমীদারির অনেক

টাকা হরিহর আত্মসাৎ করিয়াছে এবং বিষয়-সম্পত্তি অনন্তশিব স্বয়ং না দেখিলে, বিষয় রক্ষা করা কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে।

সত্যেন্দ্রের দুর্ভাগ্যক্রমে সেই সময়ে একটা হিসাব নিকাশের গোলমালও বাহির হইয়া পড়িল। গোলমালটা প্রায় পনের হাজার টাকার। এ গোলমালের কথা সত্যেন্দ্র কিছুই অবগত ছিল না। পূর্ব্বাহ্নে সে কথা জানিতে পারিলে সত্যেন্দ্র হয়ত তাহার নিজের বিষয়-আশয় বিক্রয় করিয়াও তাহা মিটাইয়া ফেলিত।

কিন্তু শ্বশুর-প্রীতির জন্য হিসাব পত্রের পরীক্ষা করা সত্যেন্দ্রের আর ঘটিয়া উঠে নাই। চক্ষুলজ্জায় পড়িয়া শ্বশুর মহাশয়ের উপর সমস্ত কার্য্যভার সমর্পণ করিয়া সে নিশ্চিন্ত ছিল। কর্ত্তব্যপালনে যাহারা বিমুখ, তাহাদের একদিন না একদিন বিপদে পড়িতেই হয়। সত্যেন্দ্রও বিপদে পড়িল।

অনন্তশিব খাতাপত্র লইয়া পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল—

"বাবা, এইরকম ক'রে কি আপনি বিষয় রক্ষা কর্‌ছেন?" স্তম্ভিত পিতা, বেয়াদব পুত্রের মুখের প্রতি চাহিয়া কহিলেন—

"কি—হয়েছে কি?"

"বিশেষ আর হবে কি! সত্যেন্ বাবু পনেরটী হাজার টাকা তছরূপ করেছেন—সেটা অবশ্য খাতার হিসাবে। তা'র উপর তিনি কি করেছেন, তা' আর এখন ধরে কে? আপনি কি এসব কিছুই দেখ্‌তেন না?" অসন্তুষ্ট পিতা, পুত্রের মুখের দিকে না চাহিয়াই বলিলেন—

"কে বলেছে, সত্যেন্দ্র পনের হাজার টাকা তছরূপ করেছে?"

"এই খাতা"

কথাটা বলিয়াই অনন্তশিব, পিতার সম্মুখে দুই তিনখানা খাতা ফেলিয়া দিল। নিখিলশিব খাতা কয়খানি উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিতে

লাগিলেন। অনন্ত তখন একজন কর্ম্মচারীকে ডাকিয়া চীৎকার করিয়া বলিল—

"বুঝিয়ে দাও না হে—অমন বাঁদরের মত দাঁড়িয়ে রয়েছ যে?" কর্ম্মচারী, টাকার গোলমালটা তখন দেখাইয়া দিল। নিখিলশিব ভ্রূকুটী করিয়া কহিলেন—

"এতদিন একথা আমায় বল নাই কেন?"

কর্ম্মচারী যোড়করে কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল—

"আজ্ঞে, ও গোলমালটা এত দিন ধরতে পারা যায় নি।" খাতার পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে নিখিলশিব বলিলেন—

"আচ্ছা, আজ রাত্ হয়েছে; কাল সকালে এর যথাবিহিত ব্যবস্থা করা যা'বে। যাও এখন।"

অনন্তশিব আপনমনে বকিতে বকিতে কর্ম্মচারীকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া গেল। নিখিলশিব ভাবিতে লাগিলেন—সত্যেন্দ্রের এই কাজ!"

প্রত্যূষে উঠিয়াই তিনি সত্যেন্দ্রকে ডাকিতে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। সত্যেন্দ্র আসিলে নির্ম্মলশিব জিজ্ঞাসা করিলেন—

"হাঁ হে সত্যেন্দ্র, তোমার টাকার দরকার হয়েছিল যদি ত আমাকে বল নাই কেন?"

সত্যেন্দ্র, প্রভুর কথা ঠিক্ বুঝিতে না পারিয়া একটু বিস্ময়ের ভাবই প্রকাশ করিতেছিল। কিন্তু খাতার হিসাবের দিকে নিখিলশিব যখন সত্যেন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন, তখন তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। বিশুষ্ককণ্ঠে সত্যেন্দ্র কহিল—

"আজ্ঞে এতদিন ত ওটা আমার চ'খে পড়ে নি।" নিখিলশিব হাসিয়া বলিলেন—

"সেটা তোমার অন্যায়—সেটা তোমার কর্ত্তব্যকর্ম্মে অবহেলা। তুমি

যে টাকাটা গোলমাল কর নি, সমস্তরাত্রি ভেবে আমি সেটা স্থির করেছি। কিন্তু গোলমাল যেই করুক্, দায়ী ত তুমি?"

"আজ্ঞে—"

"আজ্ঞে টাজ্ঞে চলে আমার কাছে। কিন্তু আমার কুল-প্রদীপের কাছে ত সেটা চল্‌বে না। সে এসব কথা জান্‌তে পেরেছে। তাই ভাব্‌ছি, সত্যেন্দ্র, এ যাত্রা তোমায় রক্ষা ক'র্‌ব কেমন ক'রে!

নিদ্রোত্থিত অনন্তশিব সেই সময়ে সেই গৃহে আসিয়া পড়িল। অন্য-দিন এমন সময়ে তাহার নিদ্রাই ভঙ্গ হয় না। কিন্তু সত্যেন্দ্রের কপাল-গুণে অসম্ভবও আজ সম্ভবে পরিণত হইয়াছে।

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া অনন্তশিব কহিল—

"কিহে সত্যবাবু, টাকাগুলো সঙ্গে ক'রে এনেছ, না থানা-পুলীশ কর্‌তে হ'বে। তোমার শ্বশুর কোথায়?"

অনন্তশিবকে দেখিয়া অবধিই সত্যেন্দ্র ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িয়া-ছিল। থানা-পুলীসের কথা শুনিয়া তাহার প্রাণ উড়িয়া গেল। থানা-পুলীসকে সত্যেন্দ্র অত্যন্ত ভয় করে। সত্যেন্দ্রের আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি হইল না। নিখিলশিব, সত্যেন্দ্রের মনের অবস্থাটা বিলক্ষণই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি কহিলেন—

"তুই যা' অনন্ত, মুখ ধুগে যা। আমি সব ব্যবস্থা কর্‌ছি।"

অনন্তশিব কহিল—

"আপনি ত সব ব্যবস্থাই কর্‌ছেন, আর সব ব্যবস্থাই কর্‌বেন। এস সত্যেনবাবু আমার সঙ্গে—তোমার ব্যবস্থা আমাকেই কর্‌তে হচ্ছে।"

সত্যেন্দ্রকে টানিয়া লইয়া অনন্তশিব চলিয়া গেল। নিখিলশিব, ক্রোধ, লজ্জা ও অভিমানে নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিলেন।

সত্যেন্দ্রকে আপনার বসিবার ঘরে লইয়া যাইয়া অনন্তশিব অনেক

ভৎর্সনা করিল, অনেক দুর্ব্বাক্য কহিল, অনেক ভয় দেখাইল, অনেক অপমানের কথা বলিল। কোনও কথাতেই সত্যেন্দ্র কথা কহিল না। তাহার মনে তখন তরঙ্গের ঘাতপ্রতিঘাত চলিতেছে, সে কি আর তখন তাহাতে আছে যে কথার উত্তরে কথা কহিবে।

অনন্তশিব এইবার সত্যেন্দ্রকে নানারূপ লোভ দেখাইতে আরম্ভ করিল। অনন্তের প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলে, সত্যেন্দ্রের যে আর কোনও ভয়ের কারণ নাই, তাহা অনন্তশিব ভাল করিয়াই বুঝাইবার চেষ্টা করিল। তাহার প্রস্তাব অতি কুৎসিত—প্রস্তাবটা সত্যেন্দ্রের পত্নী সম্বন্ধে।

সত্যেন্দ্রের পায়ের তলা হইতে পৃথিবী সরিয়া গেল—চক্ষে সে অন্ধকার দেখিতে লাগিল। দাঁড়াইয়া থাকিবার তাহার আর শক্তি রহিল না। যখন লোকজন তাহাকে ধরাধরি করিয়া তুলিতে গেল, তখন সত্যেন্দ্র সংজ্ঞাহীন।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সত্যেন্দ্রের জ্ঞান আর হইল না। অজ্ঞানাবস্থাতেই তাহাকে তাহার বাটীতে লইয়া যাওয়া হইল।

চিকিৎসক তাহার জীবনের আর আশা করিতে পরিতেছে না। রোগ কঠিন। রোগীর মস্তিষ্কের শিরা ছিঁড়িয়া গিয়াছে।

"বড়্‌দা'র" কাছে লোক পাঠাইয়া দেওয়া ভিন্ন নীহারিকার আর গত্যন্তর ছিল না। সে তাহাই করিল। বিপদের সময় লজ্জা, অভিমান, সঙ্কোচ আর কাহার থাকে?

নীহারিকার প্রেরিত লোকের মুখে সকল সমাচার শ্রবণানন্তর চিন্তামণি তখনই কলিকাতায় রওনা হইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তাঁহার তত অভিমান, তত মর্ম্মান্তিক দুঃখ কোথায় যে ভাসিয়া গেল, তাহার ঠিকানা কে করিবে?

যাত্রার উদ্যোগ হইতে লাগিল। অভয়াসুন্দরী কহিলেন—

"তা'ও কি হয়! আমাকেও যেতে হ'বে। সতুর অসুখ শুনে আমি কি নিশ্চিন্ত থাকৃতে পারি?"

তরুলতারও ঐ কথা। তরু যাইলে নীলুকেও সঙ্গে লইতে হইবে। চিন্তামণি বিপদে পড়িয়া গেলেন।

পীতাম্বরও পিতার সঙ্গে যাইতে চাহিল। তরুর শাসনে পীতাম্বর এখন সত্যেন্দ্রকে ভালবাসিতে শিখিয়াছে।

উপায়ান্তর না দেখিয়া সকলকে সঙ্গে লইয়াই চিন্তামণি কলিকাতায় রওনা হইলেন। জনাবালি ইহলোকে থাকিলে সেও "বড়্‌দা"র সঙ্গে

যাইতে চাহিত। চিন্তামণি সেই কথাই বার বার মনে করিতে লাগিলেন।

স্ত্রীপুত্রাদি সঙ্গে লইয়া চিন্তামণি যখন সত্যেন্দ্রের বাটীতে আসিয়া পৌঁছিলেন, তখন সে বাটীতে ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছে। অভয়া-সুন্দরীকে দেখিয়া দুর্গাবতী চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল—

"দিদি গো, যদি আর কিছু দিন আগে আস্তে, তা' হ'লে আমার নীরের সংসার এমন ক'রে পুড়ে ছাই হ'য়ে যেত না গো। তুমি কেন এলে না দিদি ?"

কথাটা খুব অভিমানের। দুর্গাবতীর কথা শুনিয়া চিন্তামণি, অভয়াসুন্দরী ও অন্যান্য সকলের দুঃখে বুক কাটিয়া যাইতে লাগিল।

নীহারিকা তখন মৃতপতির পায়ের উপর মাথা রাখিয়া পড়িয়া আছে। তাহার চক্ষে জল নাই—মুখে হা-হুতাশের শব্দটুকুও নাই। অভাগিনী তখনও বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না যে তাহার এমন সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে।

সত্যেন্দ্রের শিশু-পুত্র অনাথকৃষ্ণ মাতামহীর ক্রন্দন শুনিয়া মাতার পিঠের উপর পড়িয়া কাঁদিতেছিল। নীহারিকার তাহাতে বিরক্তির সীমা ছিল না। সে বলিতেছে—"সবাই মিলে অমন ক'রে কাঁদ্‌লে ওঁর অমঙ্গল হ'বে যে!"

নিখিলশিব লোকজন সংগ্রহ করিয়া শবদেহ স্থানান্তরিত করিবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। কিন্তু শবদেহ স্পর্শ করিবার শক্তি কাহার? নীহারিকা তখন কি আর কাহারও কথা মানিতেছে ?

চিন্তামণি, অভাগিনীর নিকটে যাইয়া চক্ষের জল রুদ্ধ করিয়া বুক বাঁধিয়া কহিলেন—

"নীরু, ছেড়ে দে মা।"

স্বপ্নোত্থিতার মত উঠিয়া বসিয়া নীহারিকা কহিল—

"বড়্দা' এসেছ! বাঁচাও—বড়্দা', বাঁচাও। অজ্ঞান হ'য়ে আছেন মাত্র। ভাল ডাক্তার ডেকে ওষুধ দিলেই ওঁর সব অসুখ সেরে যা'বে।"

চিন্তামণি আপনার বুক দুই হস্তে চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন—

"ডাক্তাররা আস্‌ছেন। তুই ও ঘরে যা'ত মা!"

নীহারিকা, অভয়াসুন্দরীর সঙ্গে গৃহান্তরে চলিয়া গেল। শবদেহ বহন করিয়া লইবার জন্য যাহারা বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিল, "বড়্দা"র ইঙ্গিতে শবদেহ স্থানান্তরিত করিতে তাহারা আর বিলম্ব করিল না। উচ্চকণ্ঠে "হরিধ্বনি" তাহারা দিতে পারে নাই। সে বিষয়ে চিন্তামণির বিশেষ নিষেধ ছিল।

সেইদিন হইতে নীহারিকা উন্মাদিনী। তাহার উন্মত্ততা আর ইহ-জীবনে সারিল না। তাহার পিতা হরিহরের নাম শুনিলে নীহারিকার উন্মত্ততা অধিকতর বাড়িত। কথা শুনিত সে কেবল "বড়্দা'র"। বড়্দা' ভিন্ন স্নানাহার তাহাকে অন্য কেহই করাইতে পারিত না।

শ্রাদ্ধাদির পর চিন্তামণি যখন সকলকে লইয়া দেশে ফিরিয়া আসিলেন, তখন নীহারিকা "তাঁ'র" খোঁজ্‌টা "তাঁ'র" বাসভবনে যাইয়াই করিতে লাগিল। যখন কিছুতেই নীহারিকা স্বামীর সন্ধান পাইল না, তখন সে তাহার শৈশবের স্মৃতি-মন্দির—সেই পিয়ালাতলেই আশ্রয় গ্রহণ করিল। সেই "পেয়ারাতলায়" বসিয়া তাহাদের কত সুখের দিনই না কাটিয়া গিয়াছে।

দুর্গাবতীর আগ্রহাতিশয্যে চিন্তামণি, দুর্গাবতীকে কাশীধামে হরিহরের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। নীহারিকা তাহার মাতার সঙ্গে কিছুতেই যাইতে চাহিল না। অনাথকৃষ্ণ ও নীহারিকা "বড়্দা'র" নিকটেই রহিল। তবে সত্যেন্দ্রের বাসভবনের দিকে উন্মাদিনী নীহারিকাকে

চিন্তামণি এখন আর যাইতে দেন না। ঋণের দায়ে সত্যেন্দ্রের বাস্তু ও তালুকখানি বিক্রয় হইয়া গিয়াছে।

অনাথকৃষ্ণের ভার এখন পীতাম্বর গ্রহণ করিয়াছে। নীলু ও অনাথ পীতাম্বরের চক্ষে এখন সমান। চিন্তামণি ও অভয়াসুন্দরীকে সে বিষয়ে এখন আর বড় বেশী ভাবিতে হয় না। তরুলতা, নীহারিকাকে লইয়াই সর্ব্বদা ব্যস্ত। উন্মাদিনী কখন যে কি করিয়া বসিবে, তাহার ত স্থিরতা নাই।

চিন্তামণি, দেশের লোকের মঙ্গল চিন্তা লইয়া যেমন ছিলেন, সেইরূপই রহিলেন। সে চিন্তাতেও কিন্তু সত্যেন্দ্রের শোক তিনি ভুলিতে পারিলেন না। জাগ্রতাবস্থায় তিনি দেশের লোকের সেবা করিয়া সত্যেন্দ্রকে একপ্রকার ভুলিয়া থাকিতেন, কিন্তু নিদ্রিতাবস্থায় তিনি দেখিতেন—সতু আসিয়া যেন তাঁহার মাথার কাছে দাঁড়াইয়া ডাকিতেছে —"বড়্দা' ও বড়্দা'।" জনাবালিও এখন আবার সতুবাবুর সঙ্গী হইয়াছে।

বড়্দা' ভাবিলেন—এ কি বিপদ। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার মনে হইল এ বিপদে দুঃখিত হইবার কিছুই নাই। জীবনে যে যাহার প্রিয় থাকে, মরণেও সে তাহার প্রিয় না থাকিবে কেন? জীবনের পরপারে যাইলেই শরীরী কি অশরীরীকে ভুলিতে পারে, না অশরীরী শরীরীকে ভুলিয়া যায়!

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে এ সকল চিন্তায় চিন্তামণি সুখী হইতেন কিম্বা দুঃখ ভোগ করিতেন। চিন্তামণির মত যাঁহারা "দেশের বড়্দা" হইবার যোগ্য, তাঁহারাই এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন। কিন্তু "দেশের বড়্দা" কয় জন?

—•—